দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

দেশের রাষ্ট্রপতি রূপে
সার্থক-নিরপেক্ষ অবস্থান
তাঁকে রাজনৈতিক মহীরুহে
পরিণত করেছে — পৃঃ ১১

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ
ধীরে ধীরে উন্মোচিত
হচ্ছে — পৃঃ ৩২

৭৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০।। ২১ ভাদ্র - ১৪২৭। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

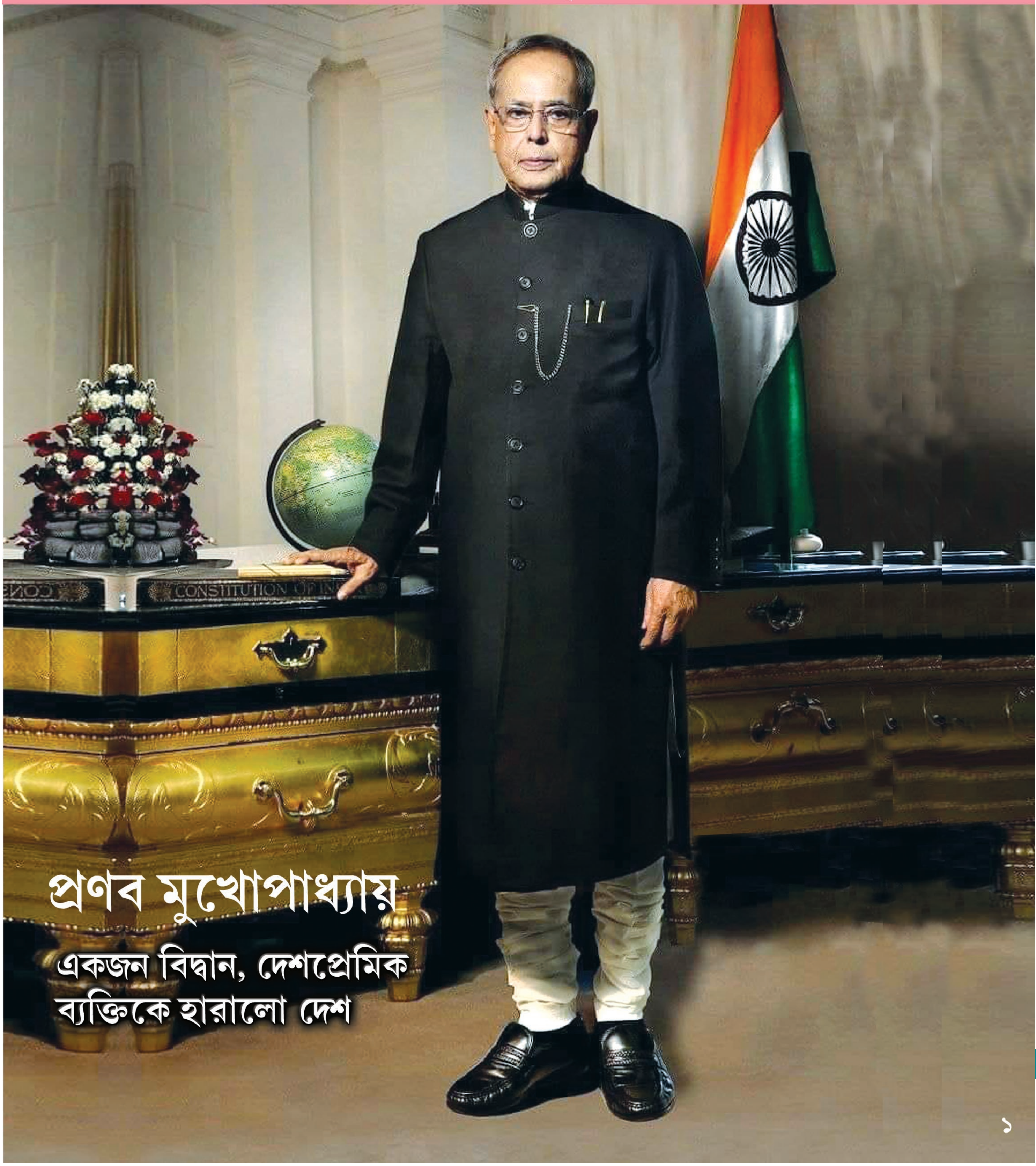

প্রণব মুখোপাধ্যায়

একজন বিদ্বান, দেশপ্রেমিক
ব্যক্তিকে হারালো দেশ

BELLA VISTA
51 Limited Edition Flats
Flat Starts From ₹87 Lac Onwards
Birds Eye View
Roof Top Garden
Swimming Pool
Podium
WBHIRA Registration Number : HIRA/P/KOL/2019/000483
www.edengroup.in
Developed by: EDEN
JALAN
9830 116 116

www.edengroup.in
HIRA/P/KOL/2018/000058
https://hira.wb.gov.in/
EDEN TOLLY CASCADES
15.37 L
Onwards
1/2/3 BHK
WITHIN
KMC
AREA
ONLY 1% & 5% GST
Cascades of Happiness !
NEAR HARIDEVPUR
OFF KABARDANGA MORE
AC Banquet Hall I Gymnasium I Rooftop Swimming Pool I Rooftop Garden I Indoor Games Room
Meeting Lounge 'The Den' I Children's Play Area (Indoor) I Children's Open Play Area
EDEN
17/1 Landsdowne Terrace
Kolkata - 700026 (Behind Deshapriya Park)
• 9830305003

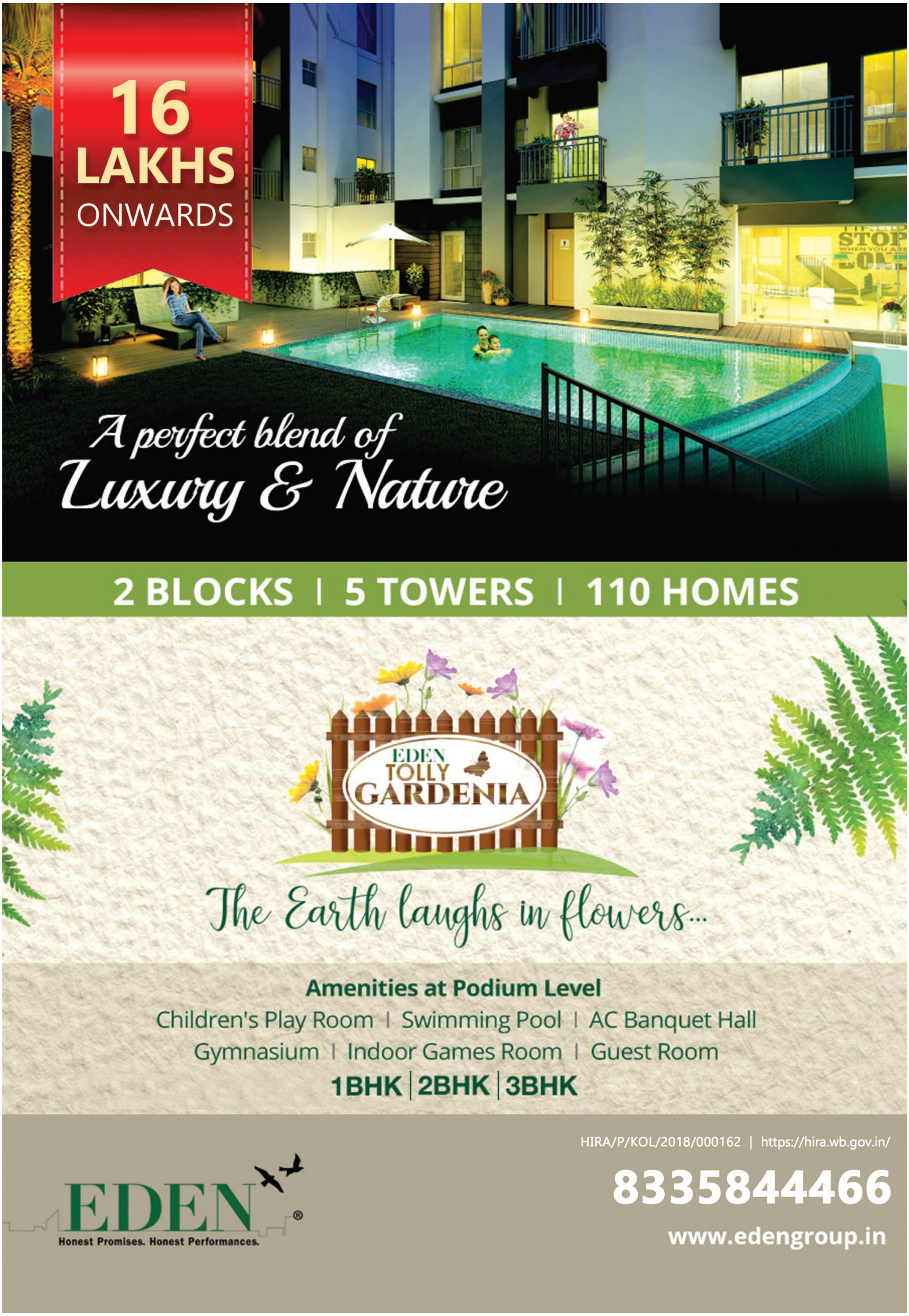

16 LAKHS ONWARDS
A perfect blend of Luxury & Nature
2 BLOCKS | 5 TOWERS | 110 HOMES
EDEN TOLLY GARDENIA
The Earth laughs in flowers...
Amenities at Podium Level
Children's Play Room | Swimming Pool | AC Banquet Hall
Gymnasium | Indoor Games Room | Guest Room
1BHK | 2BHK | 3BHK
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
HIRA/P/KOL/2018/000162 | https://hira.wb.gov.in/
8335844466
www.edengroup.in

HIRA/P/KOL/2019/000370
http://hira.web.gov.in
SOUTH OPEN FLATS
EDEN Ivory
Rs.14.52* L Onwards
Near 1B Bus Stand, Of E M Bypas
1BHK | 2 BHK | 3 BHK
EDEN®
Honest Promises. Honest Performances.
98304 48888
www.edengroup.in

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৭ সেপ্টেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৭

ভারতের জনবিচ্ছিন্ন বিরোধী নেতারা ক্রমশই দেশের শত্রুদের হাতের পুতুল হয়ে উঠছেন। □ সাধন কুমার পাল □ ৮

দেশের রাষ্ট্রপতি রূপে সার্থক নিরপেক্ষ অবস্থান তাঁকে রাজনৈতিক মহীরুহে পরিণত করেছে □ সৈকত চ্যাটার্জি □ ১১

প্রণব মুখার্জি ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন □ শিতাংশু গুহ □ ১৪

ধমক খাইনি কিন্তু ধমক দিতে দেখেছি তাঁকে □ সুজিত রায় □ ১৭

প্রণববাবু বাঙ্গালিয়ানার আইকন □ দেবাশিস পাইন □ ১৮

নিজ দলেই বঞ্চনার শিকার বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ প্রণববাবু □ আনন্দ দেবশর্মা □ ১৯

একজন বিদ্বান, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে হারালাম □ ডা: মোহনরাও ভাগবত □ ২১

প্রণবদার মৃত্যুতে দেশ হারাল এক সুসন্তানকে □ ভি ভাগাইয়া □ ২৩

আমরা আমাদের প্রিয় কুটুম্বকে হারালাম □ অদ্বৈতচরণ দত্ত □ ২৪

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : সংকল্পনা সমূহের স্পষ্টীকরণ □ ইন্দুমতী কাটদরে □ ২৬

নিট-জেইই এন্ট্রান্স টেস্ট বাতিলের দাবি এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি □ ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ □ ২৯

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে □ ৩২

করোনার সংক্রমণ থেকে ভারতকে কীভাবে বাঁচানো যাবে □ নন্দন নিলেকানি □ ৩৪

ভারত তথা হিন্দুবিরোধী এক সন্ত্রাসী শক্তির নাম কমিউনিজম □ রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জি □ ৩৬

ভারতে মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসের আতুড়ঘর □ চন্দন রায় □ ৩৯

সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণে হিন্দুবিদ্বেষী নেহরুর বিরোধিতা □ ডা: আর এন দাস □ ৪৩

অন-লাইনই আজ আমার বিদ্যালয় □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৪৬

করোনাকালে পরীক্ষাসংকট ও বিতর্ক □ নির্মল মাইতি □ ৪৮

করোনাকালে মানসিক চাপ থেকে একমাত্র মুক্তির উপায় হলো যোগানুশীলন □ আশীষ পাল □ ৫০

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিরুদ্ধ মতের প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল

দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছিলেন, তুমি আমার মতের সমর্থক নাই হইতে পারো, তথাপি তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য আমি সচেষ্ট থাকিব। বস্তুত এইটিই হইতেছে গণতন্ত্রের সারমর্ম। অর্থাৎ বিরোধী মতের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া। খুব কম রাজনীতিবিদই গণতন্ত্রের এই সারমর্মটি রাজনৈতিক জীবনে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যে কয়জন এই সারমর্মটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই কারণেই দলীয় রাজনীতিকে অতিক্রম করিয়া নিজেদের একটি উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পরিয়াছেন। হইয়া উঠিয়াছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। এইরকম মুষ্টিমেয় রাজনীতিকদের ভিতর অবশ্যই পড়িবেন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপ্যাধ্যায়। পরমতের প্রতি এই শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণেই আজীবন কংগ্রেসি রাজনীতিক প্রণববাবুর দ্বিধা হয় নাই নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যক্রমে উপস্থিত হইয়া নিজের বক্তব্য রাখিতে। তাঁহার এই আচরণ নিঃসন্দেহে সকল রাজনৈতিক দলের সকল নেতা এবং কর্মীর কাছে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ছয় দশকেরও অধিক দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে প্রণববাবু কখনো তাঁহার বিরোধীদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করিয়াছেন বা কটুবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন—এমন অভিযোগ কেহই করিতে পারিবেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত বিরোধ যাহাই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত ব্যবহারে সৌজন্য দ্বারা সকল পক্ষের মন জয় করিয়াছিলেন তিনি। সকলের কাছেই তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন 'প্রণবদা।' রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরামর্শ লইবার জন্য সকলেই এই 'প্রণবদা'র দ্বারস্থ হইতেন। ছয়ের দশকে রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রণববাবু প্রথম পদার্পণ করেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি প্রথম রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে সংসদে প্রবেশ করেন। তীক্ষ্ণ মেধীসম্পন্ন এই রাজনীতিককে চিনিতে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভুল করেন নাই। সত্বর নিজের মহিমা পরিমণ্ডলের ভিতর প্রণবাবুকে স্থান দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তাহার পর হইতেই রাজনীতিতে প্রণবাবুর উত্থান দ্রুতগতিতে। ১৯৭৭ সালে জনতাপার্টির কাছে পরাজিত হইবার পর ই ন্দিরার একদা অনুচরেরা সকলেই যখন ইন্দিরাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন প্রণববাবুই ইন্দিরার পাশে বিশ্বস্ত সঙ্গীর মতো ছিলে ন। প্রণববাবু নিজেকে বলিতেন 'কংগ্রেস ম্যান'। রাজীব গান্ধীর সঙ্গে মতান্তরের কারণে সামান্য কিছুদিন কংগ্রেসের বাহিরে থাকিলেও অচিরে আবার কংগ্রেসেই ফিরিয়া আসেন। যে কোনো সংকটে কংগ্রেসকে এই প্রণববাবুরই শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তিনি সত্যই ছিলেন ভারতীয় চাণক্য।

জাতীয় রাজনীতিতে যে উচ্চতায় প্রণববাবু নিজেকে লইয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালি রাজনীতিকদের ভিতর খুব ব্যক্তিত্বই পারিয়াছেন সেই উচ্চতায় নিজেকে লইয়া যাইতে। এক অখ্যাত স্কুল শিক্ষক হইতে রাষ্ট্রপতি ভবন—তাঁহার এই দীর্ঘ যাত্রাপথের সবটাই যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল তাহা নহে। কিন্তু নিজের যোগ্যতায় এবং বুদ্ধিমত্তায় তিনি পারিয়াছিলেন এই দীর্ঘ পথটি অতিক্রম করিতে। স্বাধীন ভারতে এখনও পর্যন্ত তিনিই প্রথম বাঙ্গালি রাষ্ট্রপতি। এই প্রথম বাঙ্গালি রাষ্ট্রপতির প্রতি বাঙ্গালির অন্তরের শ্রদ্ধা চিরকাল অটুট থাকিবে।

সুভাষিতম্

নিষ্ণাতোঽপি চ শাস্ত্রার্থং সাধুত্বং নৈতি দুর্মতিঃ।

আকল্পং জলমগ্নাপি মার্দবং নৈতি বৈ শিলা।

শাস্ত্রজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েও দুষ্ট ব্যক্তি সাধুত্ব প্রাপ্ত হয় না। যেমন যুগ যুগ ধরে পাথর জলে ডুবে থাকলেও নরম হয় না।

ভারতের জনবিচ্ছিন্ন বিরোধী নেতারা ক্রমশই দেশের শত্রুদের হাতের পুতুল হয়ে উঠছেন

সাধন কুমার পাল

পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে টুইটারে ট্রেন্ড করিয়েও জেইই, এনইইটি রুখে দেওয়া গেল না। ১ সেপ্টেম্বর নির্বিঘ্নেই দেশ জুড়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা শুরু হলো। করোনা অতিমারী আবহে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার জন্য পৌঁছতে সমস্যা হলেও পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা দেখে এবং শেষপর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পেরে পরীক্ষার্থীরা খুশি। দেশ জুড়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্যতম ক্ষোভ বা অসন্তোষও পরিলক্ষিত হয়নি। পরীক্ষা নেওয়ার বিরোধিতা করে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর বিক্ষোভের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছিল তারা যে প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার্থীই নয় তার প্রমাণ হয়ে গেল। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত হওয়ায় সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে দেশের ভেতর রক্ত ঝরাতে ব্যর্থ হয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতবিরোধী যুদ্ধে শামিল হয়েছে।

৩০ আগস্ট রবিবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কী বাত ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়। ৩১ আগস্ট সোমবার বিকেল পর্যন্ত লাইক বেশি থাকলেও ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অর্থাৎ জয়েন্টএন্ট্রান্স পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে দেখা আপলোড করা যায় বক্তৃতার ভিডিয়োতে 'ডিসলাইক' ছাপিয়ে গিয়েছে 'লাইক'কে। বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অবশ্য টুইট করে দাবি করেন, 'ইউটিউবের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ওই ডিসলাইকের মাত্র ২ শতাংশ ভারত থেকে করা হয়েছে।' বিজেপির অভিযোগ, কংগ্রেসের উদ্যোগেই নিট-জেইই আয়োজনের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অপপ্রচার করা হয়েছে। নো এক্সামিনেশন গ্যাং-কে তোল্লাই দেওয়া সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণ এই 'অপছন্দ' আসলে সরকারের পরীক্ষা-নীতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বলেই মনে করছেন অনেক। যেমন তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান টুইটারে এই সংক্রান্ত খবর শেয়ার করে একে পড়ুয়াদের অনাস্থা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। আনন্দবাজারকে নুসরত বলেন, 'পড়ুয়াদের এই অতিমারীতে যেভাবে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হলো, তার বিরোধিতার জন্যই এই ডিসলাইক।'

> **পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের পরীক্ষা বিরোধী অবস্থানে পরীক্ষার্থীরা আদৌ নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা এই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই সংশয় এ রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের উপর একটি বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি করেছে, যা অবশ্যই প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো প্রতিবন্ধকতা।**

পাকিস্তান ও চীনের মতো দেশ থেকে তৈরি করা এই কৃত্রিম সরকার বিরোধী 'জনমত'কে রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জিরা নিজের জয় বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এর আগে রাহুল গান্ধী মমতা ব্যানার্জিদের বিভিন্ন বক্তব্য পাকিস্তান বিশ্বের দরবারে ভারত বিরোধী জনমত গঠনে কাজ লাগিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এই ঘটনাবলি থেকে স্পষ্ট যে ভারতের মাটিতে জনবিচ্ছিন্ন এই বিরোধী নেতারা ক্রমশই দেশের শত্রুদের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই নব্য 'জয়চাঁদদের' আবির্ভাব ভারতের ভাগ্যাকাশে আবার কোনো অশনি সংকেত বয়ে আনছে না তো?

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতি বছর এপ্রিল মাসেই জেইই, এনইইটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং জুলাই মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। করোনা অতিমারীর জন্য এবার সময় মতো এই পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতি বছরের মতো এ বছরও লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঘরে বসে অধীর আগ্রহে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে। গত ১৭ আগস্ট সেপ্টেম্বরে ন্যাশনাল ইলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (এনইইটি), জয়েন্টএন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জেইই) আয়োজন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর জেইই ও ১৩ সেপ্টেম্বর নিট পরীক্ষার আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)।

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফ থেকে জানানো হয়েছে পরীক্ষার্থীদের থার্মালস্ক্রিনিং করা, স্যানিটাইজার, গ্লাভস, টুপি সরবরাহ করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, পরীক্ষা কেন্দ্র সেনিটাইজ করার মতো সমস্তরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনে করোনা সংক্রমিত পরীক্ষার্থীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এবার সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা হওয়ার ফলে এই শিক্ষাবর্ষ ডিসেম্বর মাসের আগে শুরু করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ডিসেম্বরে প্রথম সেমিস্টার অনুষ্ঠিত হতো। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম সেমিস্টারের সঙ্গে আপোশ করেই শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না আরও দেরি করে পরীক্ষা নেওয়া হলে এই শিক্ষাবর্ষকে নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়। এই শিক্ষাবর্ষ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে না পারলে আগামী শিক্ষাবর্ষে চলমান বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। যাতে অনেকেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে একটি বছর দেশ কোনোরকম ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার পাবে না।

এই নির্দেশ আসতেই দেশজুড়ে রাজনৈতিক ঝড় তুলে দিলেন বিরোধী দলগুলি। নিট-জেইই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার দাবিতে শীর্ষ আদালত হাজির হলো ছয়টি রাজ্য। দেশের অ-বিজেপি ছয়টি রাজ্যের মন্ত্রীসভার একজন করে সদস্য এই আবেদন করেছেন। এই ছয়টি রাজ্য হলো--- পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড়। ১৭ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছিল, ‘‘কেরিয়ার নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। করোনা আগামী এক বছর চলতে পারে। এই এক বছর পরীক্ষা বন্ধ থাকবে? জীবন থেমে থাকতে পারে না। তাই সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’’ এই রায় পুনর্বিবেচনার দাবিতে ২১ আগস্ট ফের সুপ্রিম কোর্ট দরবার করেছে ওই ছয়টি রাজ্য। এদিকে, চলতি সপ্তাহেই অবিজেপি দলগুলোকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন সোনিয়া গান্ধী। জিএসটি খাতে রাজ্যগুলোর বরাদ্দ বৃদ্ধি ও নিট-জেইই স্থগিত রাখতে রণকৌশল তৈরির জন্যই ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে এই রাজনৈতিক আয়োজন। এই দুই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল বিরোধী জোটের এই বৈঠকে। তারপর এদিন সুপ্রিম কোর্টে এই দরবার।

বিরোধী দলগুলির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে জেইই, এনইইটি ওরা যেন ‘পড়ে পাওয়া ষোল আনা’র মতো রাজনৈতিক ইস্যু হাতে পেয়ে গিয়েছেন। খুব সস্তায় জনদরদি হয়ে উঠার মতো এত বড়ো সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? একদিকে যখন আনলকের সময় যানবাহন চলতে শুরু করেছে, রাস্তা-ঘাটে প্রচুর ভিড় হচ্ছে, কলকারখানা খুলছে, পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছে, সেই সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা, অভিভাবক-অভিভাবিকারা সংক্রমিত হয়ে যেতে পারেন এই আশঙ্কা ছড়িয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির ছবি তুলে একটি কৃত্রিম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। মাস্কহীন মানুষের ভিড় জমিয়ে ‘হেলথ বিফোর এক্সামিনেশন’ ব্যানার ঝুলিয়ে মিছিল করা হচ্ছে। শুধু সুপ্রিম কোর্টেই নয়, বিরোধী দলগুলির দাবিকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনসব মিথ্যে খবর ট্রেন্ড করাচ্ছে যা দেখলে এটাই মনে হবে যে পরিকল্পনা করে বিশৃঙ্খলা তৈরির উদ্দেশ্যেই এসব করা হচ্ছে। জি নিউজ এরকম বেশ কয়েকটি খবরের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ছবি পোস্ট করে বিরোধীরা এটা প্রমাণ করার প্রয়াস হয়েছে যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরীক্ষার্থীরা লড়ছে, সেই ছবিটি আসলে ২০১৮ সালের অন্য একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ছবি। এক পরীক্ষার্থী ওর বাবার করোনা পজিটিভ রিপোর্টের ছবি তুলে ধরে বলছে, আমি কীভাবে পরীক্ষা দেব? জি নিউজের ময়না তদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে আসে যে ওই কোভিড পজিটিভ রিপোর্টটি আসলে লাহোরের। হাতের শিরা কেটে এই পরীক্ষার প্রতিবাদ করছে এরকম একটি পোস্টের ময়না তদন্তে উঠে আসে যে অনেক দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ওই ছবিটি অন্য কারণে পোস্ট করা হয়েছিল। বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার ময়না তদন্তে উঠে এসেছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় নো এক্সামিনেশন মতের পক্ষে যে সমস্ত বিষয় ট্রেন্ড করানো হচ্ছে তাতে পাকিস্তানিদের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। নিট জেইই বন্ধের দাবিতে পাকিস্তানিদের আগ্রহ দেখে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য। সরকার যদি এই পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতো তাহলে হয়তো পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আন্দোলন হতো এবং এই আন্দোলনের জন্য একই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হতো। কারণ করোনার মধ্যেই বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে এই দলগুলি ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছে।

আজ যারা জেইই, নিট নেওয়ার বিরোধিতা করছে এই তারাই কিছুদিন আগে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ পুনরায় লাগু করার দাবিতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা করেছিল। এই ইস্যুতেও পাকিস্তান এই দলগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন ইস্যুতে বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার বিরোধী যে কোনো ইস্যুতে এই বিরোধী দলগুলির পাশে যেভাবে সন্ত্রাসবাদের আতুড়ঘর পাকিস্তান দাঁড়াচ্ছে তাতে এই প্রশ্নটি উঠে আসছে দেশ বড়ো না ক্ষমতার রাজনীতি বড়ো?

এদিকে কেরলে একেবারে নীরবে এই করোনার মধ্যেই ১৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। মে মাসে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা আয়োজন করা হলেও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিডের সংক্রমণ ধরা পড়ল না। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তমাস আইজ্যাক গত ১৫ জুন একটি টুইট করে তিনি জানান, ‘১৪ দিন আগে ১৩ লক্ষ

স্কুলপড়ুয়া তাদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। একজন পড়ুয়াও কোভিডে আক্রান্ত হয়নি।'

দেশের অন্য রাজ্যগুলি যখন পরীক্ষার সূচি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে, তখন কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর থমকে থাকার পরীক্ষা শুরু করার ঘোষণা করে দিয়েছিল কেরল। গত ২৬ মে এই পরীক্ষা শুরু হয়। অবশ্যই পরীক্ষা আয়োজন করার জন্য কেন্দ্রের অনুমতির প্রয়োজন ছিল আর সে অনুমতি কেন্দ্র দিয়েও দিয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হয় ৩১ মে। রাজ্যের তিন হাজারটি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রেই দু'জন করে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়। পরীক্ষার্থী-সহ যাঁরা যাঁরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকছেন, তাঁদের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজরদারি চালানো হয়। করোনা সংক্রমণ প্রকাশিত হতে প্রায় ১৪ দিন লেগে যায়। সেজন্য পরীক্ষা শেষের ১৪ দিন পর কেরলের অর্থমন্ত্রী থমাস আইজ্যাকের টুইট করে জানান :

'14 days ago 13 lakh school students completed school final exams in Kerala. Not a single student affected by Covid. It was meficulously planned : schools sanitised. Masks distributed to all. Thermal readings mandatory. Physical distancing ensured. Operation success. #covidkerala Thomas Isaac (@drthomasisaac) June 15, 2020' । সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা চালালে যে সংক্রমণ এড়ানো যায় সেটা আইজ্যাকের এই দাবিতেই স্পষ্ট। আনলক সেপ্টেম্বরের তুলনায় সম্পূর্ণ লকডাউনের মে মাসে করোনা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল। সে সময় কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল কোনো প্রতিবাদ করেনি, কোনো মিছিল হয়নি, কেউ সুপ্রিম কোর্টে যায়নি কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতেও কোনো ফেক নিউজ চালায়নি। অতি বিপ্লবী বামপন্থী সংগঠনগুলিও শীত ঘুমে চলে গিয়েছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝাই যায় নিষ্পাপ পরীক্ষার্থীদের বলির পাঁঠা বানিয়ে বিজেপি বিরোধিতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এদিকে ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেড় শতাধিক শিক্ষাবিদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই পরীক্ষা আয়োজনের পক্ষেই সায় দিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাঁদের মতে, জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেন) (JEE Mains) এবং নিট নিয়ে আরও দেরি করা মানে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে আপোশ করা হয়ে যাবে। তাঁরা আরও লেখেন, 'কিছু মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলার চেষ্টা করছে।' প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে একথাও বলা হয়েছে, ''যুবসমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীরা জাতির ভবিষ্যৎ, কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও অনিশ্চয়তার মেঘ জমে উঠেছে। ভর্তি ও পঠনপাঠন সম্পর্কে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে প্রাথমিক ভাবে তার সমাধান করা দরকার।''

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে 'সরকার জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেন) এবং নিট পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে দিয়েছে... এখন পরীক্ষা নিতে আরও দেরি করা মানে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান একটি বছর নষ্ট করে দেওয়া। আমাদের যুবসমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে কোনও মূল্যেই আপোশ করা যাবে না। তবে কেউ কেউ তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে এবং সরকারের বিরোধিতা করার জন্য আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে খেলার চেষ্টা করছে'।

ওই বিশেষ চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ইগনু, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়, জেএইইউ, বিএইচইউ, আইআইটি দিল্লি এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় , বেন গুরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকী ইজরায়েলের মতো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত ভারতীয় শিক্ষাবিদরা।

''আমরা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করি যে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের সম্পর্কে যত্নশীল হবে এবং ২০২০-২১ সালের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারটি বজায় রাখা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেই জয়েন্টের মেন এবং নিট পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালনা করবে।'' গত ২৬ সেপ্টেম্বরই জাতীয় পরীক্ষক সংস্থার প্রকাশিত অ্যাডমিট কার্ড ইতিমধ্যেই ডাউনলোড করেছে ১৪ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী। ওড়িশা সরকার যে সমস্ত শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে সে রকম ৭টি শহরে পরীক্ষা চলা পর্যন্ত লকডাউন বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য রাজ্যজুড়ে যাতায়াতের অনুমোদন দিয়েছে। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে নিয়ে তারা ব্যক্তিগত গাড়ি, ভাড়া করা গাড়ি কিংবা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ভ্রমণ করতে পারে। ওড়িশা রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করবে। অন্যদিকে এই লেখা পাঠানোর সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমাতে সেপ্টেম্বরের ৭, ১১ ও ১২ তারিখ রাজ্যজুড়ে কমপ্লিট লকডাউন হচ্ছেই। এদিকে ৭ তারিখ লকডাউন হওয়ার জন্য ৬ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষ করে পরীক্ষার্থীরা বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা এবং ১১, ১২ লকডাউন হওয়ার জন্য ১৩ তারিখ নিট পরীক্ষার জন্য পড়ুয়ারা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবে কিনা এই নিয়ে প্রবল চাপে রয়েছে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের পরীক্ষা বিরোধী অবস্থানে পরীক্ষার্থীরা আদৌ নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা এই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই সংশয় এ রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের উপর একটি বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি করেছে, যা অবশ্যই প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো প্রতিবন্ধকতা। রাজ্য সরকারের এই মানসিকতা সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে থাকা একটি রাজ্যকে যে আরও পিছিয়ে দেবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ■

দেশের রাষ্ট্রপতিরূপে সার্থক-নিরপেক্ষ অবস্থান তাঁকে রাজনৈতিক মহীরুহে পরিণত করেছে

বীরভূমের জেলার এক গ্রাম থেকে উঠে আসা স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সন্তান একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ঘাত প্রতিঘাত কুশলতার সঙ্গে সামলে রাজনীতির বিভিন্ন পদ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করে তিনি হয়ে উঠেছেন দেশের সবচেয়ে সফল বাঙ্গালি রাজনীতিক।

সৈকত চ্যাটার্জী

প্রথমে বলি যে, তাঁর বিচারধারা ও কর্মপদ্ধতির আলোচনা করলেও অন্তরের অন্তস্থলে তাঁর কর্মের 'ঠিক-ভুল' বিশ্লেষণ করতে বসিনি। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের দুরবস্থার জন্যে তাঁর সক্রিয়তা যতটা দায়ী, অন্যদের নিষ্ক্রিয়তা ততটাই দায়ী। নয়তো প্রিয়রঞ্জন-কুমুদ ভটচাজদের মতো 'নীতিবাগীশ' নেতৃত্ব থাকতে মমতা ব্যানার্জিকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল কেন? একমাত্র অধীর রঞ্জন চৌধুরী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 'অভিমন্যু' রূপে বারংবার একা হয়ে যেতেন।

কিন্তু তবুও তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মাদি ঠিক না বেঠিক তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণার আমি কেউ নই। সেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঠিক করবে। আমি নৈর্ব্যক্তিক এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না রেখেই। দিনের শেষে বিরাট কোনো বিদ্বেষ বা ভালোবাসা কোনোটাই নেই। 'হে মহাজীবন' বলে ডাকবো না... আবার 'মহিষাসুর'-ও বলবো না... ভালো রাজনৈতিক বিশ্লেষক হতে গেলে নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ জরুরি।

আমি 'রাজনৈতিক প্রণব'-এর চেয়ে 'ব্যক্তি প্রণব'-কেই বিশ্লেষণ করবো বেশি। যদিও এতো দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এক প্রবন্ধে ধরা কঠিন। আমি সোজা করে লেখার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই একটি দৃশ্যপট কল্পনা করতে বলবো।

উত্তাল সমুদ্র। তার মধ্যে একটি ছোটো সার্ফিং বোর্ডে সার্ফিং করছেন একজন সার্ফার। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠছে। আর তার মধ্যে কখনো ঢেউয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন সার্ফার। হারিয়ে গেলেন নাকি? না... পরক্ষণেই আবার ঢেউয়ের আস্তরণ সরিয়ে প্রকট হচ্ছেন। পদস্খলন মানেই অবশ্য মৃত্যু। এই অবস্থায় সার্ফারকে কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকালে চলবে না, সার্ফিং বোর্ডের সঙ্গে আটকে থাকতে হবে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবেই ঢেউকে পেরিয়ে। স্বার্থপর বলা যাবে কিনা জানি না, কিন্তু সারভিবর-ও বটে।

কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতির উত্তুঙ্গ সমুদ্রে ওই 'সার্ফার'টিই প্রণব মুখার্জি।

তিনটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রণববাবুর চরিত্র বিশ্লেষণ করবো রাজনৈতিক ছাত্রদের সুবিধার্থে।

১. নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা : সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মতো

পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর ছিল না, বরকত গণিখান চৌধুরীর মতো উত্তাল জনসমর্থন অর্জনের কোনোদিন চেষ্টাও করেননি, অতুল্য ঘোষের মতো মহাজ্ঞানীও ছিলেন না।

কিন্তু তিনি জানতেন, তাঁর কোথায় দুর্বলতা। তাই দুর্বলতাগুলিকে ঢেকে শক্তিশালী জায়গাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন চিরকাল। আঁকড়ে ধরেছেন 'সার্ফিং বোর্ড'টিকে। সেই 'সার্ফিং বোর্ড'টি হলো, দলের 'সর্বোচ্চ নেতৃত্ব'— 'বাংলা কংগ্রেস'-এ থাকতে আঁকড়ে ধরেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়কে, তাঁর জোরেই রাজ্যসভাতে পৌঁছেছিলেন ১৯৬৯ সালে। গিয়েই আঁকড়ে ধরেন ইন্দিরা গান্ধীকে। তারপরে নরসিংহ রাও, সোনিয়া গান্ধী, মমতা ব্যানার্জি, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, নরেন্দ্র মোদী— একে একে আঁকড়ে ধরেছেন বিভিন্ন নেতাকে। যখনই বুঝেছেন যে সেই নেতা তাঁর উত্থানের পক্ষে অপরিহার্য, তিনিও হয়ে উঠতে চেয়েছেন সেই নেতার কাছে অপরিহার্য।

কিন্তু 'সর্বোচ্চ নেতা'র কাছে পৌঁছনো এতই কী সহজ?

উত্তর : যদি সাংগঠনিক পথে যাওয়ার চেষ্টা হয়, তাহলে সারাজীবন লেগে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক দলে থাকে অন্য একটি 'পথ'— রাজনৈতিক দলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি থাকে না। থাকলেও তারা বিশেষ কল্কে পায় না লবি না বুঝলে, সুতরাং সঠিক ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখার লোক নেহাতই কম থাকে। প্রণববাবু অজয় মুখার্জি ও ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পৌঁছন ওই চিঠি ড্রাফটিং করার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে। সেখান থেকে কোনোদিন সরেননি। কংগ্রেসের সব গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ড্রাফট করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিতেন। এর ফলে পার্টি সংগঠনে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেখানেই নিজেকে থামিয়ে রাখেননি। খুব দ্রুত বুঝে গেছিলেন যে, রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে গেলে 'অর্থনীতি'র ক্ষেত্রটিতে প্রভাব ফেলতে হবে। নিজে ছিলেন ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। 'অর্থনীতি' তাঁর বিষয় ছিল না, কিন্তু রাজ্যসভায় পৌঁছতেই 'অর্থনীতি'কেই আঁকড়ে ধরলেন। একটু সুবিধা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী ওই ১৯৬৯-৭২ সময়টায় বামেদের বুদ্ধি নিয়ে অর্থনীতি পরিবর্তন করছিলেন বলে— উপদেষ্টাদের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙ্গালি। আর 'বাংলা কংগ্রেস' করার ফলে প্রণববাবুর এই বামেদের সঙ্গে সখ্য ছিল। ফলে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' বোঝার অনেক ভালো 'শিক্ষক' পেয়েছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতনে পড়ার কারণে বাংলা ও বাঙ্গালিপ্রেমী ছিলেন। বাংলা বুঝতেন। সামান্য বলতেও পারতেন। রবীন্দ্রসংগীত শুনতে ভালোবাসতেন। আনন্দময়ী মা ও ভরত মহারাজের সঙ্গে বাংলাতেই বাক্যালাপ করতেন। প্রণববাবুর স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়কে (যাঁকে প্রণববাবু 'গীতা' নামে ডাকতেন) নিয়মিত ইন্দিরা গান্ধীকে রবীন্দ্রসংগীত শোনাতেন। বাঙ্গালি খাবার রান্না করে নিয়ে যেতেন। ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি ছাড়েননি, বোঝার চেষ্টা করতেন কোনো নেতার জোর আছে, তারপরে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর গুডবুকে থাকা যায়।

তিনি একের পর এক কোয়ালিটি আহরণ করেছেন এবং একের পর এক নেতার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন।

২. কঠোর পরিশ্রম এবং একমুখী মানসিকতা : প্রণব মুখার্জি আমাদের দেখা কংগ্রেসের সব নেতার চেয়ে বেশি পরিশ্রমী ছিলেন। 'রাজনীতিতে সর্বোচ্চ স্তরে যেতে গেলে বুদ্ধিজীবী হতে হয়', তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন। এতে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গভাবে 'বুদ্ধিজীবী' হয়ে ওঠার চেষ্টার কোনো খামতি ছিল না। তিনি 'সংসদীয় রাজনীতি'র সংসদটিকে আঁকড়ে ধলেছিলেন। একগাদা কমিটির মধ্যে ঢুকে থাকতেন এবং ওই কমিটিগুলির মাধ্যমে দেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি এবং পলিসি তৈরি অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। যেগুলি পরবর্তীকালে তাঁর খুব কাজে লেগেছিল।

তাঁর লেখা বইগুলি পড়ে দেখলেই বোঝা যাবে। আবার অতুলবাবু, নরসিমহা রাও, ড. মনমোহন সিংহ, অশোক মিত্র, ভবানী সেনগুপ্ত, হিরেন মুখার্জি, মোহিত সেন কিংবা জওহরলাল নেহরুর লেখায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট, প্রণববাবুর লেখা নিতান্ত কেজো লেখা। কেউ ওইগুলো পড়ে বিরাট তৃপ্ত হতে পারবে না বোঝাই যায়, তাঁর 'জ্ঞান আহরণ' চরম পরিশ্রমের ফল এবং লেখার মধ্যে তার ছাপ স্পষ্ট।

'একমুখী মানসিকতা'টি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। আমাকে টি কে থাকতেই হবে— যে কোনো উপায়ে সকল সহযোগী দলকে ম্যানেজ করে ইউপিএ সরকার চালানোয় তা স্পষ্ট। বামেরা সমর্থন প্রত্যাহার করলেও ইউপিএ টিকে গেছিল সমাজবাদী সাংসদদের সমর্থনে।

'যোগ্যতা'র বদলে 'আনুগত্য'কে গুরুত্ব দিতেন বলেই প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির চেয়ে সোমেন মিত্র তাঁর কাছের ছিলেন বেশি।

৩. 'সময়' বোঝার ক্ষমতা : প্রণববাবুর সময় বোঝার ক্ষমতা ভালো ছিল— কিন্তু সেটি তাঁর ওই পরিশ্রম ও একমুখী মানসিকতার ফলাফল। তিনি খেলোয়াড় হওয়ার বদলে খেলা নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি পছন্দ করতেন। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। সোনিয়া গান্ধীর জনসমর্থন ছিল, ড. মনমোহন সিংহের ছিল পাণ্ডিত্য। দুটোতেই প্রণববাবু 'সেকেন্ড বেস্ট' ছিলেন।

সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি বা হতে দেয়নি। কিন্তু তিনি বেশ ভালোই বুঝতে পারতেন যে কখন নরসিমহা রাওয়ের সময় শুরু ও গান্ধী পরিবারের শেষ, আবার কখন সোনিয়া গান্ধীর সময় শুরু ও সীতারাম কেশরীর শেষ, কখন মমতার সময় শুরু ও সোমেন মিত্রের শেষ, কখন নরেন্দ্র মোদীর সময় শুরু ও সোনিয়া গান্ধীর শেষ।

কংগ্রেসের ক্রাইসিস ম্যানেজার (নিন্দুকেরা বলেন এর অনেকগুলি ক্রাইসিস তাঁরই সৃষ্টি নিজেই সমাধান করার জন্য), সুবক্তা, চণ্ডীপাঠ, দুর্গাপুজো করা, গীতার শ্লোক আউড়ে বিরোধী হিন্দুনেতাকে চুপ করানো এসব ছিল তাঁর চরিত্রের নানান দিক, ব্যক্তিগত ক্যারিশমা। নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে আমন্ত্রণ গ্রহণ এবং সেই সভায় গিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের ভাবনা সম্পর্কে তাঁর ভাষণ একটি মাইলফলক।

সবচেয়ে সফল বাঙ্গালি রাজনীতিক?

তাঁর সাফল্যটি 'ব্যক্তিগত', 'বাঙ্গালি' বলে নয়। সেই কারণেই তাঁর 'ভারতরত্ন' আমবাঙ্গালির মনে বিরাট কোনো উদ্বেলতা তোলেনি। সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হননি। কিন্তু বাঙ্গালির মনে তাঁদের গুরুত্ব বেশি।

প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রপতি হবার ভোটে নিজের রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সমর্থন পাননি, অথচ বিরোধী অনেক দল শিবসেনা ইত্যাদির সমর্থন পেয়েছেন। মনে আক্ষেপ ছিল ভোটে লড়ে জিতে লোকসভায় যেতে পারেননি। রাজ্যসভার সাংসদ হতে হতো বারবার। সে দুঃখ ঘোচে অধীরবাবুর উদ্যোগে জঙ্গীপুর থেকে পরপর জয়ে। অপবাদ ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার ফেলতে তেমন উদ্যোগী নন, সে দাগ ঘোচে ২০১১-তে সার্থক তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের মাধ্যমে জয়লাভের পর।

ব্যর্থতা : বড়ো মানুষের জীবনেও ব্যর্থতা থাকে। থাকে বলেই সে জীবনে বড়ো সাফল্য আসে। রাজীব গান্ধীর সময় কংগ্রেস ছেড়ে আলাদা দল গড়েন, সে দল চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়, ফলে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসতে হয়। ছেলে অভিজিৎবাবুর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার এখনও সার্থক বা প্রতিষ্ঠিত নয়, মেয়ে শর্মিষ্ঠা দেবী দিল্লি কেন্দ্রিক রাজনীতি করতে গিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ। প্রণববাবুর সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হতে না পারা বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে একবারও বসতে না পারা বেদনাদায়ক।

সবশেষে বলি, কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলা বীরভূমের এক গ্রাম থেকে উঠে আসা স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সন্তান একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ঘাত প্রতিঘাত কুশলতার সঙ্গে সামলে রাজনীতির বিভিন্ন পদ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক সামলানো এবং শেষে দেশের রাষ্ট্রপতিরূপে সার্থক-নিরপেক্ষ অবস্থান তাঁকে রাজনৈতিক মহীরুহে পরিণত করেছে। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

(লেখক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান)

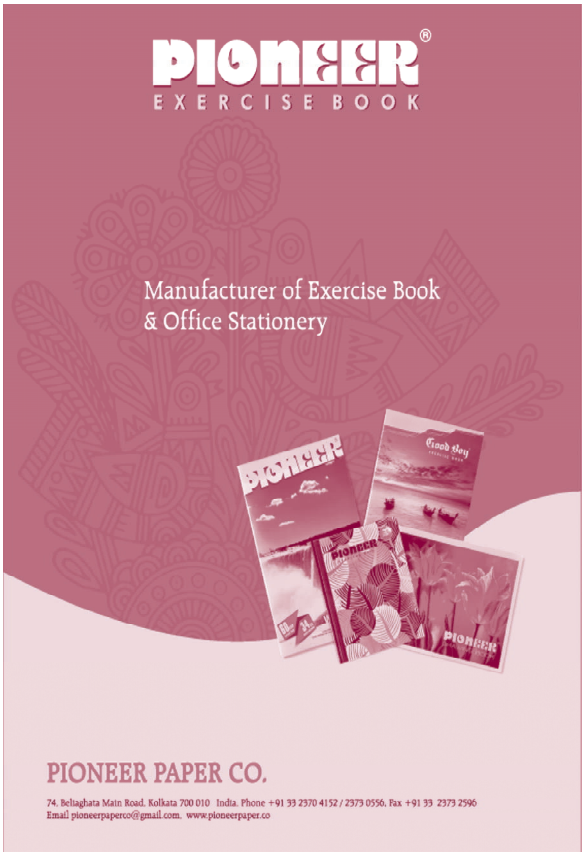

প্রণব মুখার্জি ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন

শিতাংশু গুহ

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি চলে গেলেন। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি। তাঁর শোকে বাঙ্গালি শোকাভিভূত। তিনি নড়াইলের জামাই, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলে নড়াইলের মানুষ আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছিল পিতা-পুত্রী সম্পর্ক। জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্যে তিনি ছিলেন আশীর্বাদ। শেখ হাসিনা এই সম্পর্কটি সুন্দর, সফলভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ভারতে প্রথমবার বিজেপি ক্ষমতায় এলে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক নিয়ে অনেকে চিন্তিত ছিলেন, প্রণব মুখার্জি এ সম্পর্ক অটুট রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

হয়তো বাঙ্গালি বলে এই সজ্জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটি চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গত দুই দশক তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। বাংলাদেশের বেশ কিছু নেতাকেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছিলাম। প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর মন্ত্রী হবার পেছনে প্রণব মুখার্জির আশীর্বাদ ছিল। সজীব ওয়াজেদ জয় আমাদের সঙ্গে ছোট্ট একটি বৈঠকে বলেছিলেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রী হবেন না। এরপর জয়কে রাজি করাতে পারতেন দু'জন লোক, এর একজন প্রণব মুখার্জি। ২০০৮ সালে ২৭ জুলাই সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভার্জিনিয়ার বাসায় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমায় বলেছিলেন, দাদার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। আমি তা রেখেছিলাম।

দাদার সঙ্গে প্রথম ও শেষ দেখার কথা আমার মনে আছে। প্রথম দেখা সুখকর হলেও শেষ দেখাটি তা ছিল না। গত বছর অর্থাৎ ২০১৯-এর ২৮ নভেম্বর দিল্লিতে দাদার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁর পুত্র অভিজিৎ মুখার্জি কলকাতা থেকে দিল্লিতে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন। ২০১৪-র

এপ্রিলে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাতের পর ২০১৯-এর শেষ বৈঠক। ২০১৭-তে আমি ৪ দিনের জন্যে দিল্লি গেলেও দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি বা দেখা করার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইনি, তখন দাদার প্রতি আমাদের কিছুটা অভিমান, ক্ষোভ জমা হয়েছে। কারণ দাদা আমাদের, মানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্যে কিছু করেননি।

তিনি ছোটো-বড়ো সবার দাদা। তিনি বিদেশমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালে যতবার নিউইয়র্কে এসেছেন বা আমি দিল্লি গেছি, প্রায় প্রত্যেকবার দাদার সাক্ষাৎ পেয়েছি। নিউইয়র্কে একবার দাদার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলাম, তখন তিনি বিদেশমন্ত্রী। মন্ত্রীর অফিস জানালো মাত্র ৩ জন? আমরা গেলাম ৮ জন। অফিস ৩ জনের বেশি দেবে না। বললাম, দাদাকে বলুন, আমরা সবাই আসবো। অফিসার গেলেন, ফিরে এসে জানালেন দাদা অনুমতি দেননি, একটু পর হেসে বলেন, আপনি প্রথা ভেঙে দিয়েছেন, স্যার সবাইকে যেতে বলেছেন, আমরা গেলাম।

রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তাঁর সঙ্গে বৈঠকের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অনেক কষ্ট করে অতীত বহু মিটিংয়ের প্রসঙ্গ টানার পর সাক্ষাতের অনুমতি পাই। আমরা প্রায় এক ডজন দেশের এক কুড়ি জন নেতাকে নিয়ে যাই। বিশাল ব্যবস্থা, বৈঠকের শুরু ও শেষে আপ্যায়নের সুব্যবস্থা। ভারতের সুবিশাল রাষ্ট্রপতি ভবনে ঢোকার সুযোগ হলো। শুরুতে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি আমায় ডাকলেন। বললেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম করা যাবে না। সময় বিশ মিনিট। বললাম, ঠিক আছে। আমরা সবাই অপেক্ষমান, দাদা মিটিং ঘরে ঢুকলেন, সবাই দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে দাদাকে নমস্কার জানালেন। দাদা প্রত্যুত্তরে একই কায়দায় সবাইকে নমস্কার জানালেন।

দাদা বসলেন। প্রেসিডেন্টের ফটোগ্রাফার ছবি তুললেন। আমাদের সঙ্গে চার-পাঁচ জন মহিলা ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা জানালেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আবেগে আপ্লুত হলেন। তিনি সবার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বললেন, আমি দেখছি কী করা যায়। কেউ কেউ তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন। মিটিং চললো ৪৫ মিনিট। দাদা চলে গেলেন। আমরা তখন স্ন্যাক্স খেতে শুরু করলাম। সবাই খুশি। খানিক পর একজন এসে প্রশ্ন করলেন, 'হু ইজ শিতাংশু'। বললাম, আমি। জানালেন, প্রেসিডেন্ট আপনাকে ডেকেছেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি আমায় ডেকেছেন, আমি খুশি, আপ্লুত। ভারতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্ত বৈঠক। আমার মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে, অভাবনীয়। তবে আমি অপ্রস্তুত ছিলাম না, দাদার সঙ্গে আগেও আমি একা কথা বলেছি। প্রেসিডেন্টের অফিসে ঢুকলাম। দাদা সোফাতে বসা, আমায় পাশের আর একটি সোফায় বসতে বললেন। বসলাম। দাদা ডেকেছেন তাই প্রথম কথা তিনিই বললেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্যাখ্যা দিলেন কেন আমাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। জানালেন, গণতন্ত্রে 'পা-ধরাটা' অশোভন। বুঝলাম। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একা অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। বোঝা গেল তিনি বৈঠক নিয়ে সন্তুষ্ট।

ভারতের রাষ্ট্রপতি আমায় ডেকেছেন, আমি খুশি, আপ্লুত। ভারতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্ত বৈঠক। আমার মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে, অভাবনীয়।

বললাম, দাদা, আপনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আমাদের জন্যে কিছু একটা করে যান, বাংলাদেশের হিন্দু ও সংখ্যালঘুরা আপনাকে আজীবন মনে রাখবে। সামনের টেবিলে অনেক রঙের ফোন। সুযোগ পেয়ে বলেই ফেললাম, দাদা, একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন। ইতিমধ্যে ৮-৯ মিনিট পার হয়ে গেছে। দাদা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি। এই সংক্ষিপ্ত স্বল্প সময়ের বৈঠকের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে।

দাদা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন কিনা জানি না, তবে আমাদের ফাইলটি তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে চিঠি দিয়ে আমাদের সেই কথা জানানো হয়েছিল। আমাদের বৈঠকের সংবাদ ও ছবি সেদিন ভারতের টিভিতে এসেছিল। সরকারিভাবে আমাদের কাছে ছবি পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশে সরকার বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। তাঁরা কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান। যদিও আমাদের চাওয়া ছিল দাদাকে দিয়ে অন্তত একটি দাবি আদায় করা, আমরা পারিনি।

২০০৮ সালের ১ অক্টোবর, দাদা নিউইয়র্কে ছিলেন। সম্ভবত তখন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি জানতে চাইলেন, তোমার নেত্রীর খবর কী? বললাম, নেত্রী তো ৩-৪ দিন আগে জানালেন যে তিনি নিশ্চিত নন, আওয়ামি লিগ সামনের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসছে কিনা? প্রণব মুখার্জি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কবি সুকান্তের মতো গালে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসবে। আমি সজীব ওয়াজেদ জয়কে জানালাম। তিনি বললেন, দাদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৯-এর মিটিং খুব একটা

সুখপ্রদ ছিল না। দাদার বয়স হয়েছে। সবাইকে চেনেন না, কানে যন্ত্র থাকলেও কথা খুব কম শুনেন। তাঁর অফিসে তিনজনের বেশি ঢুকতে দেবে না। আমরা সাতজন ঢুকলাম। নমস্কার সেরে বললাম, বাইরে আরও চারজন আছে, দাদা একবারে সবাইকে ডেকে নিলে ভালো হতো। দাদা রাজি হলেন, সবাই ঢুকলেন, আরও চেয়ার আনাতে হলো। এক পর্যায়ে দাদাকে আবার বলালাম, দাদা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে একটু ফোন দিলে ভালো হতো। তিনি একটু রাগলেন, তাঁকে আগে কখনো রাগতে দেখিনি। বললেন, এখন আমার কোনো প্রটোকল নেই! অবশ্য তিনি বলেন, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের কাছে তিনি বিষয়টি জানতে চাইবেন।

দাদার সঙ্গে প্রথম মিটিং হয়েছিল দিল্লিতে, সন তারিখ মনে নেই? তবে তখন বিএনপি ক্ষমতায়। ২০০১-এ সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বিশ্ব উদ্বিগ্ন। দাদা তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বাড়ির দরজায় সেনা মোতায়েন ছিল। ঢুকতেই প্রশ্ন, 'কিসকো মিলেগা'। বললাম, 'মাইজিকো'। আসলে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বৌদির সঙ্গে। বৌদি বলেছিলেন, আমি দাদাকে বলে দেব, ১০ মিনিট সময় পাবেন। ঠিক আছে। অতিথি কক্ষে ঢুকলাম, মাত্র একজন মানুষ অপেক্ষমান। অবাক হই, এতবড়ো মন্ত্রী, অথচ বাসায় ভিড় নেই! আমাদের মন্ত্রীদের বাড়িতে তো ক্যাডারদের জ্বালায় ঢোকার সুযোগ থাকে না।

একটু পরে ডাক পড়লো। ভেতরে ঢুকলাম। মনটা খুশিতে ভরে গেল। একজন বাঙ্গালি দিল্লিতে অনেক উঁচুতে। বসতে বললেন, বসলাম। নমস্কার দিলাম। তিনি প্রতি-নমস্কার দিলেন। কথা শুরু করলাম। ঠিক কী বলেছিলাম মনে নেই, তবে বিএনপি-জামাতের অত্যাচার তো ছিলই। তিনি জানতে চাইলেন, শেখ হাসিনা আমাকে চেনেন কিনা? আমার সঙ্গে ডাঃ টমাস দুলু রায় ছিলেন, তিনি কথা বলেননি। তখন আমেরিকা আফগানিস্তানে ঢুকে গেছে। সাউথ-সুদান, টিমোর বা ইরাক আমাদের আলোচনায় এসেছে। বিএনপির পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম মোরশেদ এর আগে প্রণব মুখার্জিকে নিয়ে কিছু একটা কটূক্তি করেছিলেন, আলোচনায় তাও এসেছে।

দাদা বেশ উৎসাহের সঙ্গে আমার কথা শুনছিলেন। দশ মিনিটের জায়গায় এক ঘণ্টা প্রায়। আমার আর বলার কিছু নেই, উঠতে পারলে বাঁচি। দাদাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনজন এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'দাদা, আপনি ব্রাহ্মণ, তদপুরি প্রাজ্ঞ রাজনীতিক, আপনার পায়ের ধূলি নিতে চাই'। দাদা সানন্দে রাজি হলেন, দাদাকে প্রণাম করলাম। মা-বাবার মৃত্যুর পর আমি কাউকে পা-ছুয়ে প্রণাম কললাম। টমাসদাও প্রণাম করলেন, টুকটাক কথা বললেন। খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। দাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করা সেই শুরু। সেটি বন্ধ হয় তিনি যখন প্রেসিডেন্ট। দাদা নেই, তাঁর স্মৃতি থাকবে। দাদাকে শেষ প্রণাম,

(লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

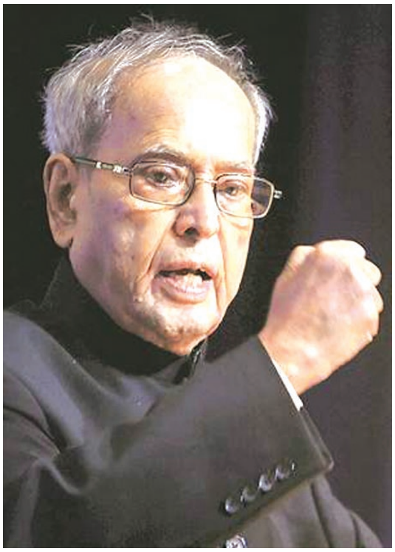

ধমক খাইনি কিন্তু ধমক দিতে দেখেছি তাঁকে

সুজিত রায়

প্রণব মুখার্জি কেমন মানুষ ছিলেন? দাম্ভিক? রসবোধহীন? রাশভারী? স্বার্থপর? প্রতিহিংসাপরায়ণ? পশ্চিমবঙ্গ বিমুখ?

উত্তর খুঁজব পরে। তার আগে কিছু স্মৃতিচারণ করা যাক। দীর্ঘ ৩০ বছরের ওপর সাংবাদিকতা করেছেন কলকাতায় ও দিল্লিতে, এমন কোনও ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ভার, যাঁরা প্রণব মুখার্জির সান্নিধ্যে আসেননি। তার মধ্যে যাঁরা দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন দিল্লিতে, তাঁরা এসেছেন প্রণব মুখার্জির অন্তরঙ্গ বৃত্তে। আমি ১৯৮৪ সাল থেকে টানা বেশ কয়েকবছর কাটিয়েছি দিল্লিতে। অবশ্য সেই পরিধির মধ্যে বহুবার দিল্লি-কলকাতা জার্নিও করতে হয়েছে পেশার সূত্রেই। স্বাভাবিকভাবে প্রণব মুখার্জি অনেকের মতোই আমার কাছেও ছিলেন প্রণবদা।

তখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। প্রণবদার রাজনৈতিক অবস্থান বেশ দুর্বল। যে কোনও কারণেই হোক, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে প্রণবদার তখন গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দূরত্ব। সঠিক কারণটা প্রকাশ্যে বলা যাবে না কোনোদিনই, কারণ রাজীব গান্ধী কিংবা প্রণব মুখার্জি দুজনের কেউই কখনও সে কথা স্পষ্ট করেননি। এরকম একটা সময়েই একবার একটি বেশ চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে যে, রাজীব গান্ধী যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি থাকাকালীন নাকি প্রবল প্রতাপশালী ইন্দিরা- ঘনিষ্ঠ প্রণব মুখার্জিকে ডেকে পাঠিয়ে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। দুর্নীতিটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের এক আমলার মেয়ের বিয়েতে অত্যন্ত মূল্যবান একটি উপহার দেওয়া। বিস্তারিত তথ্যে সৌজন্যবশত যাচ্ছি না। তবে একটা কথা বলতেই হবে, সেই সময়েই প্রণব মুখার্জি ধীরুভাই আম্বানির ব্যবসায়িক উন্নয়নে একটু বেশি মন দিয়ে 'ওনলি বিমল' ডাকনামটি অর্জন করে ফেলেছেন। প্রণব মুখার্জি অস্বীকার করেননি, কারণ রাজীব গান্ধী যা বলেছিলেন, তা মিথ্যা নয় এবং তিনি এর মধ্যে কোনও দুর্নীতি খুঁজে পাননি। কিন্তু রাজীবের গোঁসা তাতে বেড়েই গিয়েছিল।

বেশ জমিয়েই লিখেছিলাম খবরটা। এবং এমনও মনে হয়েছিল যে ইন্দিরা হত্যার পর প্রণব মুখার্জিকে মন্ত্রী না করে অপমান করার পিছনে রাজীব গান্ধীর পুরনো গোঁসাটাই হয়তো কাজ করেছিল।

না, প্রণবদা সব দেখেও কোনোদিন জানতে চাননি, কেন লিখেছি খবরটা? কিন্তু শুভ্রাদি, মানে তাঁর স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় স্নেহের সুরেই ধমকেছিলেন : 'খবর না লিখলেই হতো না?' না, জবাব দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাইনি। না, বলিনি, সাংবাদিকের কাজ খবর করা। মুখ দেখে খবর করা বা না করার দায় একজন সাংবাদিকের থাকে না যদি না তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে। এর পরেও কিন্তু শুভ্রাদি কখনও দূরে ঠেলেননি। চা খাইয়েছেন, জলখাবার খাইয়েছেন, রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছেন, মেয়ে শর্মিষ্ঠার নাচের অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মাঝে কেটে গেছে আরও দুটো বছর। অপমানিত প্রণব মুখার্জি কংগ্রেস ছেড়েছেন। গড়েছেন রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস। প্রচারে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। আমি এসেছি তাঁর প্রচার কভার করতে।

শান্তিনিকেতনে বিশ্রামরত প্রণবদার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার। আর কেউ নেই। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা, নতুন দল করা— এসব নিয়ে নানা প্রশ্নের মধ্যেও একবারও রাজীব গান্ধী কিংবা কংগ্রেস প্রসঙ্গে তিনি কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা করেননি। বরং বারে বারেই বলেছেন, 'কেউ যদি ভুল রাজনীতি করে, তাহলে তার দায় কংগ্রেস নেবে কেন? কংগ্রেসের উচিত ভুল সংশোধন করা।' সেদিন আমি ইচ্ছে করেই তুলেছিলাম ১৯৮২-র ঘটনা যখন রাজীব গান্ধী তাঁকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। শুধু এটাই মিলিয়ে নিতে যে আমার খবরের প্রতিবাদ করেন কিনা, তা জানতে। না, প্রতিবাদ করেননি। ধমকও দেননি। বরং বলেছিলেন, 'তোমার কাজ তুমি করেছ। আমি কেন প্রতিবাদ করব? আর খবরটা তো ভুল নয়।'

কিন্তু প্রণবদা যে কীভাবে ধমক দিতে পারেন, তারও একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। তখন আমি কলকাতায়। সদ্য গৃহীত বাজেট প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিধান ভবনে প্রণবদার প্রেস কনফারেন্স। একটি ইংরেজি কাগজের এক সাংবাদিক একটা প্রশ্ন করলেন বাজেট নিয়েই। প্রণবদা উত্তর দিলেন এবং বুঝিয়ে ছিলেন, প্রশ্নকর্তার সংখ্যাতত্ত্বে ভুল আছে, তাই প্রশ্নটাও ভুল হচ্ছে। ওই সাংবাদিক তা মানবেন না। প্রণবদা বার বার তিনবার বোঝালেন। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। এবার বোমা ফাটল। ধৈর্যশীল মাস্টারমশাই প্রণবদার হাতে ভাগ্যিস বেত ছিল না। চিৎকার করে উঠলেন— 'সংখ্যাতত্ত্ব তুমি আমায় শেখাবে? বাজেট তুমি আমায় বোঝাবে? শোন...' বলে পরপর পাঁচ বছরের বাজেট বিশ্লেষণ করে গেলেন টানা আধঘণ্টা ধরে প্রতিটি বছরের দফাওয়ারি আর্থিক বরাদ্দের সংখ্যাতত্ত্ব আউড়ে। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে আর হাঁ হয়ে ভাবছি। বাবা, কার সঙ্গে লেগেছে। এমন যাঁর স্মৃতিশক্তি তাঁর সঙ্গে তর্ক? কভি নেহি! ইংরেজি কাগজের ওই সাংবাদিকটিও 'থ'।

কিন্তু না, বকাঝকাটাও ছিল দাদার মতোই। রাজনীতিবিদের মতো নয়। ভ্যানিটি, গ্ল্যামার—

এসবের মোহকখনও জড়াতে পারেনি প্রণবদাকে। শুভ্রাদিকেও নয়। ক্ষমতার চরম শীর্ষে থেকেও কলকাতার ঘরের ছোটো ডিভানেই একটু সরে বসে বসতে বলতেন। এমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি যেদিন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। নিজের গ্রামের গল্প বলতে শুরু করলে থামতেন না। কীর্ণাহার, মিরিট, বড়দি, বড়দা, ছোটো ছোটো ভাই-বোনদের কথা বলতেন অকপটে। স্পষ্ট করেই বলতেন— 'আমি আস্তিক। একথা বলতে আমি দ্বিধা করি না। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। আমি পারিবারিক পরম্পরার অনুগামী। পরিবারের নিয়ম মেনেই প্রতি বছর বাড়ির দুর্গাপুজোয় চণ্ডীপাঠ করি। আমার ভালো লাগে।'

'গীতা পাঠ করেন প্রণবদা?'

'করি বই কী! আমি মনে করি ধর্ম যে যার সে তার। বুক ফুলিয়ে ঢাক পিটিয়ে আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ বলার লোক নই। তবে রাজনৈতিক জীবনে আমার গীতা ভারতের সংবিধান। গত ৫০ বছর ধরেই ওই সংবিধানকে গীতার মতোই সম্মান দিয়েছি।'

জীবনে দুঃখবোধ ছিল অনেক। কিন্তু তা কোনোদিন প্রকাশ্যে আনেননি। তবে একেবারে জীবনের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আমন্ত্রণে নাগপুরে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর আক্ষেপ করেছিলেন, 'আমার বক্তৃতা দেওয়ার ছবিটা রয়ে গেল মানুষের মনে। কিন্তু আমার বক্তৃতাটা মানুষ মনে রাখল না।' আপাদমস্তক কংগ্রেস কর্মী প্রণব মুখার্জির আরও একটা আক্ষেপ ছিল— 'স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই দক্ষিণপন্থী শক্তি ও অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলি যদি কংগ্রেস বিরোধিতা এভাবে না করত, তাহলে আজ কংগ্রেসের এই অবস্থা হতো না।'

অসম্ভব বিচক্ষণতা, তীব্র বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধা, অর্থনীতি-বোদ্ধা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ, লড়াইয়ের ময়দানে অনন্ত কর্মযোদ্ধা, বিশ্রাম বিমুখ, মোহ বিমুখ, প্রায় নিঃশত্রু এক প্রবল ক্ষমতাধারী মানুষটার হাতে সব শক্তি উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর মা-বাবা। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি ছিল— তাঁর হৃদয়। ওইটুকু মানুষ, কেউ কেউ ভালোবেসেই ঠাট্টা করত 'বেঁটে বামুন' বলে, অথচ কী বিশাল হৃদয়। তা না হলে যে কংগ্রেসের নেতা জওহরলাল পদে পদে একদা ফাঁসাতে চেয়েছেন প্রখর হিন্দুত্ববাদী বীর সাভারকারকে, সেই কংগ্রেসেরই অভিন্ন অঙ্গ হয়ে তিনি যেতে পারতেন নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরে বক্তৃতা দিতে ?

প্রণবদা কিছু না। রাজনীতিবিদ নন, অর্থনীতিবিদ নন, সমাজবিদ নন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ নন— প্রণব মুখার্জি একটা ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস। বাঙ্গালির ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস।

ভালো থাকুন। শান্তিতে থাকুন প্রণবদা। ■

প্রণববাবু বাঙ্গালিয়ানার আইকন

দেবাশিস পাইন

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পরেও, অনেকে তাঁকে ক্রাইসিস ম্যানেজার, চাণক্য ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করছেন। কিন্তু আমি পেয়েছিলাম একদম ভিন্ন রূপে।

প্রণববাবু ছিলেন, মার্জিত, সদালাপী ও সৌজন্য বোধসম্পন্ন এক নিখাদ বাঙ্গালিয়ানায় ভরপুর এক মানুষ। তাঁর কাছে পেয়েছি দাদার স্নেহ, পিতার উপদেশ

এবং ভুল বা অনৈতিক কর্মে কঠোর ভাবে তিরস্কার। কেউ কিছু শিখতে বা জানতে চাইলে বিমুখ করেছেন এমনটা কদাপি দেখিনি। রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়ে রেফারেন্স সহকারে বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত। ১৯৮৫ সালে এক নির্বাচনী জনসভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হই এবং সেই গুণমুগ্ধতা আজও অম্লান। তখন সিনিয়রদের বলয় ছিল, ভেদ করতে পারতাম না। পরে, ১৯৮৯ থেকে ২০১৯ অবধি নৈকট্য বেড়ে সম্পর্ক অনেক সাবলীল হয়েছিল। ২০০৭-২০১০ সালে সর্বভারতীয় যুব সংগঠনের কাজের সুবাদে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে। সন্ধ্যায় ১৩ নং তালকাতোড়া রোডের বাড়িতে প্রায়ই ঢুঁ মারতাম। গেলেই যে দেখা পেতাম এমনটা নয়, কিন্তু বহু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক কাছ থেকে সাক্ষী থেকেছি। শিক্ষার ভাঁড়ার অফুরন্ত। ওখানেই আমায় বলেছিলেন, 'জীবনে ধৈর্যের ভূমিকা অসীম। রাজনীতি এক অনিশ্চিত বিষয়, পূর্ণ সময় ও দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে রাজনীতিতে আসা উচিত নয়'।

সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম গীতার সারাংশ। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, কর্ম করে যাও, ফলে আশা করো না। তাঁর জীবনের কর্মযোগ আমাদের শিক্ষা দেয়, কীভাবে চড়াই-উতরাই পার করে এগিয়ে গেলে ফল অনায়াসে মেলে। আর সেই ফল শুধু ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে সমগ্র জাতির অহমিকা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পর জাতীয় রাজনীতিতে শেষ বাঙ্গালি মুখ চলে গেলেন, ঠিক যে ভাবে তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েও স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন বাঙ্গালিয়ানার আইকন। ■

নিজ দলেই বঞ্চনার শিকার বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ প্রণববাবু

আনন্দ দেবশর্মা

২১ তোপের স্যালুট। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরবিদায় পূর্ব রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন প্রণব মুখার্জির। দিল্লির লোধিরোডস্থিত শ্মশানে অগ্নিস্পর্শে তাঁর নশ্বর শরীর বিলান হয়ে গেল পঞ্চভূতে। সবকিছুই হলো কোভিড প্রেটোকল মেনেই। রাতেই অস্তিভস্ম বিসর্জন করা হলো হরিদ্বারের গঙ্গায়। অবসান হলো একটি যুগের। গত ৯ আগস্ট বাড়ির বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান প্রণববাবু। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ নিয়ে পরদিন তাঁকে ভর্তি করা হলো দিল্লির সেনা হাসপাতালে। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরে দীর্ঘ সময় কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। ৩১ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শেষ হলো সেই লড়াই। শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন ভারতের প্রথম বাঙ্গালি রাষ্ট্রপতি। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় তাঁর করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। সেই কারণেই তাঁর পার্থিব শরীর সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার জন্য প্রকাশ্যে রাখা হয়নি।

প্রণববাবু ছিলেন সংবিধানের রক্ষক। অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিদেশনীতির বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আর তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তিতে উজ্জ্বল। রাজনীতির অঙ্গনে বিরোধী ও শাসকদলের মধ্যে তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অটুট রেখে সংবিদানকে রক্ষা করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম উজ্জ্বল এই ব্যক্তিত্বের জন্ম ১৯৩৫ সালে বীরভূম জেলার কীর্ণাহরের মিরাটি গ্রামে। বাবা রামদাকিঙ্কর ও মা রাজলক্ষ্মীদেবী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯-এ ইতিহাস ও ১৯৬২-তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে তিনি। ১৯৬৩-তে আইন পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে হাওড়া জেলার বাঁকড়ায় ইসলামিয়া হাইস্কুলে দু'বছর শিক্ষকতা করেন। সাংবাদিক, সরকারি কর্মচারী ও আইনজীবী হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই কীভাবে তাঁর মজ্জায় কংগ্রেস ঢুকে গিয়েছিল তা লিখেছেন তিনি ' দ্য ড্রামাটিক ডিকেড ঃ দ্য ইন্দিরা গান্ধী ইয়ার্স' পুস্তকে। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর টান সম্পর্কে স্মৃতিমেদুর প্রণববাবু লিখেছেন কীভাবে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি বাড়ির ছাদে পরিবারের সবাই মিলে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করতেন। শৈশবের সেই সব দিন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন , 'বাবা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গিয়ে খবর দিতেন স্থানীয়দের। প্রচার করতেন কংগ্রেসের আদর্শ।' এই বিদগ্ধ বাঙ্গালি প্রণববাবুকে তাঁর দল কংগ্রেস কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি। যেমন জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে জেয়নি তাঁর দল সিপিএম। তবে জ্যোতিবাবু ও প্রণববাবুর মধ্যে আমরা

একটি পার্থক্য খুঁজে পাই। তা হলো জ্যোতিবাবুর দলের একটি বড়ো অংশ ওই সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে স্বীকার করে। কিন্তু প্রণববাবুর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভুল বলার সাহস হয়নি কারও। মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে দু'বার হাতছাড়া হয় প্রণববাবুর প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার স্বপ্ন। প্রথমবার ১৯৮৪-তে, আর দ্বিতীয়বার ২০০৪ সালে। প্রথমবার রাজীব গান্ধী তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতে দেননি,

দ্বিতীয়বার সনিয়ার একক সিদ্ধান্তে এবং অবিশ্বস্ততার কারণে। নাটকীয় ভাবে ২০০৪ সালের সেই রাজনৈতিক ওঠাপড়ার সন্ধিক্ষণে রাজীবপত্নী কুর্সির দিকে এগিয়ে আনেন 'প্রায় মৌনী' ড. মনমোহন সিংহকে। মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হলে আড়ালে থেকে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজেই সম্ভব হবে বলেই তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন সনিয়া। গোটা দেশ ওই সিদ্ধান্তে শুধু বিস্মিতই নয়, যথেষ্ট বিচলিতও হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ নিজেই বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তাঁর থেকে অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন প্রণব মুখার্জি। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরসিদ তাঁর অটোবায়োগ্রাফিতে লিখেছেন, 'সেই সময় প্রণব মুখার্জির পরিবর্তে মনমোহন সিংহকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বেছে নেওয়া শুধু কংগ্রেস দলের সদস্যদেরই নয়, অন্যদেরও অবাক করেছিল। সেসময় কংগ্রেসের সবচেয়ে সিনিয়র নেতা প্রণব মুখার্জিই ছিলেন।'

রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর পদে কোনোদিন আসীন হতে পারেননি প্রণববাবু। ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিজের দেহরক্ষীর গুলিতে বাসভবনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রণববাবুকে প্রধানমন্ত্রী না করে রাজীব গান্ধীকে করা হয়। যদিও ইন্দিরা সরকারে প্রণববাবু ছিলেন অর্থমন্ত্রী অর্থাৎ 'নম্বর টু' মন্ত্রী। প্রচলিত প্রথা অনুসারে আচমকা প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সময় 'নম্বর টু'-কেই করা হয়। কিন্তু সেসময় বংশবাদ অব্যাহত রাখতে নম্বর টু প্রণববাবুকে আটকাতে প্রধানমন্ত্রী করা হয় রাজীব গান্ধীকে। গভীর দুঃখ ও অভিমানে প্রণববাবু কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়েন। যদিও তিনি সফল হননি। এরপর বোফর্স কেলেঙ্কারির জেরে রাজীব গান্ধীর সরকার যখন গভীর সংকটে, তখন কংগ্রেসের সেই দুর্দিনে ১৯৮৯ সালে ফের কংগ্রেসে ফিরে আসেন তিনি। ধীরে ধীরে নিজেকে আবার কংগ্রেসের ক্রাইসিস ম্যানেজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। ২০০৮-এ তিনি সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ পান। ২০০৪ সালে যখন আবার ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী গঠনের সুযোগ আসে, তখনও কংগ্রেস তাঁকে বিমুখ করে। অতপর ২০১২ সালে এই বাঙ্গালি ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে ২০১৭-তে মেয়াদ শেষ করেন। একমাত্র বাঙ্গালি রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন ২০১৯-এ। আর সেটাও অকংগ্রেসি সরকারেরক আমলে। তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপট যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখা যাবে, সুকৌশলে প্রণব মুখার্জিকে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য 'রাষ্ট্রপতি' নামক সোনার শিকলে বেঁধে ফেলেছিল তাঁর কংগ্রেস দল। আসলে রাজীব ও সনিয়া-পুত্র রাহুলকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর চেষ্টাই এখানে প্রধান বিষয়। প্রণববাবু নিজের আত্মজীবনীমূলক 'দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স ১০৯৬-২০১২' পুস্তকে লিখেছেন যে, জওহরলাল নেহরুর সমসাময়িক নীতিনির্ধারক নেতা কুমারস্বামী কামরাজ বলেছিলেন, 'নো হিন্দি নো পিএম'। অর্থাৎ হিন্দি জানেন না এমন কাউতে প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। এটা সত্যি যে, প্রণববাবু হিন্দি ভালো বলতে পারতেন না। তাই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। সেজন্যই অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার কংগ্রেস দলকে দল না বলে 'কংগ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড' বলেছেন।

প্রণববাবু প্রধানমন্ত্রী না হলেও কংগ্রেস দলে ও কেন্দ্রীয় সরকারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চৌহান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি কাগজে লিখেছিলেন— ' ড. মনমোহন সিংহের সরকারে প্রণবদা ছিলেন কার্যত দ্বিতীয় ব্যক্তি।' ৯৫টির বেশি মন্ত্রীগোষ্ঠী ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ৬০ বছরের বেশি সময় শৃঙ্খলা ও নিয়মের নিগড়ে বাঁধা প্রণববাবু তাঁর রাজনৈতিক সময়ের কথা তুলে ধরেছেন — 'দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স ১৯৯৬-২০১২', 'দ্য টারবিউলেন্ট ইয়ার্স ১৯৮০-১৯৯৬', 'মিডটার্ম পোল', ' বিয়ন্ড সারভাইভ্যাল', 'এমার্জিং ডাইমেনশনস অব ইন্ডিয়ান ইকনোমি', 'অব দ্য ট্র্যাক', ' সাগা অব স্টাগল্ অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস', 'চ্যালেঞ্জ বিফোর নেশন' প্রভৃতি পুস্তকে। নিজের যোগ্যতার জোরে ধীরে ধীরে শীর্ষে উঠেছেন কোনোরূপ অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে। আজকের দিনে কংগ্রেসের মধ্যে এটি বিরল ঘটনা। প্রণববাবুর জীবন নিয়ে বই লিখেছেন সাংবাদিক গৌতম লাহিড়ী। বইটিতে তিনি এক জাযাগায় লিখেছেন, " প্রণববাবু যা কিছু অর্জন করেছেন সব নিজের মেধায়। একেবারে ঘোড়ার রাজনীতি করে তিনি জাতীয় পর্যায়ে এসেছিলেন। তাঁর জীবনে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে সেই সুযোগও ছিল, কিন্তু বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়নি।" প্রণব মুখার্জি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। নিয়মিত পূজার্চনা তাঁর জীবনের অঙ্গ ছিল। প্রতিদিন সকালে ঘণ্টাধিক সময় নিয়ে চণ্ডীপাঠ করতেন। নিয়মিত উপবাস করতেন।

ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বাসের পাত্র হলেও রাজীব-সনিয়া-রাহুল-প্রিয়ংকা কেউ প্রণববাবুকে বিশ্বাস করতেন না। কারণ তাঁদের ভয় ছিল স্বাধীনচেতা সাহসী পণ্ডিত মানুষটি কখন বিরূপ হন, জো হুজুর বলতে যদি রাজি না হন, যদি কংগ্রেসের ক্ষমতার রাশ গান্ধী পরিবারের বাইরে চলে যায়! তাই বিচক্ষণ এই বাঙ্গালি নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি। তাঁকে বিশ্বাসই করতে পারেনি গান্ধী পরিবার। ইন্দিরা গান্ধীকে যদি ভারতীয় রাজনৈতিক-চলচ্চিত্রের মোহময়ী অভিনেত্রীর আসনে বসানো হয়, যদি মনমোহন সিংহকে ধরা হয় কংগ্রেস থেকে উঠে আসা নেপথ্যচরিত্র, পিভি নরসিমা রাও অন্যতম চরিত্র, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে এই চিত্রনাট্যের অন্যতম প্রযোজক প্রণব মুখার্জি। আর এই প্রযোজককেই বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে নিজের দলের কাছেই।

প্রধানমন্ত্রী না হওয়া খেদ নিয়েই ৮৪ বছর ৮ মাস বয়সে দারুণভাবে লড়তে লড়তে হেরে গেলেন মৃত্যুর কাছে। ■

একজন বিদ্বান, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে হারালাম— ডা: মোহনরাও ভাগবত

নাগপুরে সঙ্ঘের কার্যক্রমে প্রণববাবুর সঙ্গে মোহনজী।

আমরা একজন বিদ্বান, দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তাশীল একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে হারিয়েছি। ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. প্রণব মুখার্জি তাঁর পার্থিব শরীর ছেড়ে চলে যাওয়া সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি । রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আমি তাঁর সঙ্গে দু'বার সাক্ষাৎ করেছি এবং তার পরে তিন-চারবার সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁর স্বভাব এবং উদার প্রকৃতির আচরণ আমাকে প্রথম পরিচয়ে ভুলে যেতে বাধ্য করে যে আমি ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলছি। আমি অনুভব করেছি যে আমি আমার বাড়ির একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি। এই আচরণ সর্বদা, সর্বত্র সবার সঙ্গে করতে দেখেছি।

এখানে (নাগপুর) তিনি সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ বর্গ দেখতে এসেছিলেন, আগত দশ-বারোজন অতিথির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের একটি অনুষ্ঠান ছিল। সবাই এসে বসেন, প্রণবদাও এসে বসলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করতেই ড. প্রণব মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমরা এখানে পরিচয়ের জন্য এসেছি, তাই আমি নিজের পরিচয় দিয়েই শুরু করছি।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয়

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

দিয়েছিলেন— ‘আমি প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি ছিলাম’। তাঁর সরলতা ও আত্মীয়সুলভ ব্যবহার এবং সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তবে তিনি খুব অনুভবী, পরিপক্ক চিন্তাবিদও ছিলেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণে অনেক তথ্য জানা ছিল, সেই তথ্য সহজেই দিকনির্দেশিকা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করার ক্ষমতা ছিল। সুতরাং তিনি আমাদের কাছে একজন অগ্রজ পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন, তাঁর কথা পাথেয় মনে করে মনযোগ দিয়ে আরও বেশি শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতাম। আমরা অনুভব করেছি যে, তাঁর ব্যক্তিত্বে, কথাবার্তায় আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, একজন কুশল রাজনীতিবিদ, অত্যন্ত সফল জীবন তাঁর ছিল, বিভিন্ন ধরনের কৌশল জানতেন।

তবে এই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে সবাইকে অনুসরণ করার এবং রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সবাইকে আপন করে নেওয়ার প্রবণতা তাঁর আচরণে সর্বদা দেখা গিয়েছে। আমরা একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হারালাম। জাতীয় স্বার্থের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন এক দেশপ্রেমিককে হারালাম। ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণে বিবেকের পথপ্রদর্শক একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে আমরা হারালাম।

তাঁর প্রয়াণে যে ক্ষতি হয়েছে, তা কখনই পূরণ হতে পারে না। প্রণবদার সংস্পর্শে আমার মতো অনেকে অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন, একথা সবসময় আমরা স্মরণ করব। সর্বদা অনুভব করব যে তাঁর জীবন আমাদের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নিয়তির ইচ্ছা, আমরা কিছু করতে পারি না। তাঁর পরিবারের দুঃখে আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং তাঁর আত্মার সদগতির জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাই। ■

With Best Compliments

from -

A Well Wisher

প্রণবদার মৃত্যুতে দেশ হারালো এক সুসন্তানকে— ভি ভাগাইয়া

পূর্বতন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহীরুহ সম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি মাতৃভূমির প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল। স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি তিনি ছিলেন সহজ সরল, অনাড়ম্বর ও ভালাবাসায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ।

তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রণবদাকে নাগপুরে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি কলকাতা থেকে এসেছি শুনে বললেন, ‘বাঙ্গলার হিন্দুরা ভালো নেই। তাদের বাঁচাতে হবে।’ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পরম পুজ্য ডাঃ হেডগেওয়ারের বাড়িতে গয়ে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভিজিটর বুকে লিখেছেন, ‘ভারতের এক পরম দেশপ্রেমিক সন্তানের প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।’ অনুষ্ঠানের শেষে অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় পর্বের সময় প্রণবদা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি ভারতের প্রাক্তন রাষ্টপতি, কিন্তু আপনাদের প্রণবদা।’ এমনই সরল মনের মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি এতটাই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁকে নিজের পরিবারের প্রধান হিসেবে ভাবতেন।

প্রণবদার চরণে আমার শত শত প্রণাম। তিনি পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। গ্রামের বাড়ির দুর্গাপূজা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন। তাঁর শরীর আজ হয়তো আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর কর্মময় জীবন চিরকাল আমাদের দেশের জন্য কাজ করতে প্রেরণা জোগাবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

ভাগাইয়াজীর সঙ্গে প্রণববাবু।

নাগপুরে ডাক্তারজীর বাড়িতে মোহনজীর সঙ্গে প্রণববাবু।

আমরা আমাদের প্রিয় কুটুম্বকে হারালাম

অদ্বৈতচরণ দত্ত

ভারতবর্ষের গর্ব বঙ্গভূমির গর্ব, দেশের অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রণব মুখার্জি আমাদের ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল। ২০১৭ সালে দিল্লিতে একটি বৈঠকে গিয়েছিলাম, তখন একদিন সঙ্ঘের কার্যকর্তার পরিচয়ে পশ্চিমবঙ্গের একজন বিদ্বান, পণ্ডিত, উচ্চকোটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

তখন তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তাদের পরামর্শ মতো রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ইতিপূর্বে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজী তাঁর সঙ্গে দু'বার সাক্ষাৎ করেছেন। আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাতেই তিনি সাগ্রহে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কত বছর ধরে আমি সঙ্ঘের প্রচারক। আমি আমার প্রচারক জীবন প্রসঙ্গে বললাম, ৪০ বছর ধরে কাজ করছি। তিনি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন আমার বাড়ি কোথায়? যেন এক পরম আত্মীয় তাঁর স্নেহভাজন কারো সঙ্গে কথা বলছেন। আমি মেদিনীপুর বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর সম্পর্কে অনেক কথা বলতে শুরু করলেন।

তিনি জানতে চাইলেন পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজ কেমন চলছে। আমি আগ্রহের সঙ্গে বললাম— সঙ্ঘের কাজের জন্য এই সময় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ দুটিতেই ২০০ জন আমার মতো প্রচারক কাজ করছেন। তাছাড়া বহু গৃহী কার্যকর্তাও এই প্রচারকদের মতো সমর্পিত জীবন নিয়ে সঙ্ঘের কাজ করছেন। তিনি জানতে চাইছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কথা। আমি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে একদিকে নারীদের অপমান, একদিকে দেবী দুর্গা ও মা সরস্বতীর অপমান চলছে বললাম। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন — ৩৫ বছর ধরে বামপন্থীরা যা করতে পারেনি, এরা তার অনেক বেশি এই ধরনের কাজ করে চলেছে। একথা বলার সময় তাঁর চোখে-মুখে একটা চাপা ক্ষোভ অনুভব করছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তাঁর গভীর প্রেমে তিনি ওতপ্রোত। তিনি

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে অদ্বৈতচরণ দত্ত ও অন্য দুজন কার্যকর্তা।

রাষ্ট্রপতি, তাঁর বিচার, তাঁর চিন্তা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য।

কথার মাঝেই আমি স্বস্তিকা পত্রিকা তাঁর হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ দেখে তিনি জানতে চাইলেন এটা কত বছর ধরে চলছে। স্বস্তিকার ৭০ বছরের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, খুব ভালো। সারা দেশে বিভিন্ন ভাষায় এরকম ৪০টি পত্রিকার কথা আমি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'আমাদের দেশে এই ধরনের আধুনিক ও প্রাচীন চিন্তা সংবলিত সাপ্তাহিক পত্রিকা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে খুবই উপযোগী।' দেখে মনে হলো তিনি খুশি হয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে চা-পান ও জলযোগের পর তিনি বললেন, 'এবার দুর্গাপূজার সময় আপনারা আমার বাড়িতে আসুন। আপনার কুটুমদেরও নিয়ে আসবেন।' আমি বললাম আমার কুটুম তো সঙ্ঘের প্রচারক, কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা। যথারীতি দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিন বর্তমান ক্ষেত্র প্রচারক, সহ-প্রান্ত প্রচারক, বিভাগ প্রচারক, বিভাগ কার্যবাহ-সহ আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। তাঁর ছেলে অভিজিৎবাবু আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অভিজিৎবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টার কথা হলো। তারপর পূজামণ্ডপে প্রণববাবুর চণ্ডীপাঠ শুনলাম। পূজা শেষে প্রণববাবুর সঙ্গে সবার পরিচয় হলো। সেই সময় আমি তাঁর হাতে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যাটা দিলাম। তিনি আগ্রহের সঙ্গে সেটা নিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারিকে রাখতে বললেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথাবার্তায় এবার তাঁকে আমরা একজন স্বস্তিকাপ্রেমী হিসেবে নয়, একজন সঙ্ঘপ্রেমী হিসেবে তাঁকে দেখলাম। তাঁর অন্তরে সঙ্ঘের প্রতি এক অফুরন্ত শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করলাম। দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা তাঁর থেকে বিদায় নিলাম।

তাঁর প্রয়াণ হলেও তিনি আমাদের মধ্যেই আচেন। কারণ তাঁর রেখে যাওয়া কাজ, তাঁর ভাবনা এবং দীর্ঘ সময় এক বিশেষ রাজনীতি জীবনে থাকার পরেও ছুঁত-অচ্ছুত বিচার না করে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন ।

মিতভাষী লোকপ্রিয় প্রণব মুখার্জি জীবনলীলা সম্পূর্ণ করে পরম তত্ত্বে বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে আমিও সমব্যথী।পরিবারের সবাইকে সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার স্মৃতি, রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার স্মৃতি, তাঁর প্রেরণা আজও আমাকে অনেক আনন্দ দেয়। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি কত জনপ্রিয় তিনি। তাঁর সঙ্গে বসে অষ্টমীর প্রসাদ গ্রহণ করার সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন আমরা আমাদের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছি। সেই প্রণববাবু আজ আমাদের সামনে নেই। কিন্তু তাঁর প্রেরণা আমাদের মধ্যে আছে। তাঁর প্রয়াণে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবে না। সঙ্ঘের তথা সমাজের এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমাদের পরিবারের একজন কুটুম চলে গেলেন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ)

শিক্ষা প্রসঙ্গ

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ
সংকল্পনা সমূহের স্পষ্টীকরণ

ইন্দুমতী কাটদরে

৬. অধ্যাত্ম

অধ্যাত্ম হচ্ছে ভারতের একটি বিশেষ দর্শন। সৃষ্টি রচনার মূলে রয়েছে আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব হচ্ছে অব্যক্ত, অপরিবর্তনীয়, বিমূর্ত কল্পনা যা থেকে এই ব্যক্ত সৃষ্টি নির্মিত হয়েছে। অব্যক্ত আত্মতত্ত্বই ব্যক্ত সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আত্ম ও সৃষ্টির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অব্যক্ত আত্মতত্ত্ব থেকে ব্যক্তি সৃষ্টি কেন হলো তার কারণ কেবল আত্মতত্ত্বের সংকল্প।

এই সৃষ্টিতে আত্মতত্ত্ব সর্বত্রই পরস্পর সম্পর্কিত রূপে রয়েছে। আর সেইজন্যই সৃষ্টির সমস্ত সম্বন্ধের সকল ব্যবহারের এবং সকল ব্যবস্থার মূল অধিষ্ঠান হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বের অধিষ্ঠানের ওপর যা কিছু রয়েছে তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক। এটা তার ভাবাত্মক নয়, বরং বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা। এজন্য আধ্যাত্মিকতা গৈরিক বস্ত্র, সন্ন্যাস, মঠ, মন্দির বা সংসারত্যাগের সঙ্গে যুক্ত সংকল্পনা নয়, বরং সংসারের সব ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত তত্ত্ব। আজ এই বক্তব্যের মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়েছে।

এই সংকল্পনার কারণে সৃষ্টির সমস্ত রচনায় তথা ব্যবস্থায় একাত্মতার কল্পনা করা হয়েছে। যেখানে যেখানেই একাত্মতা রয়েছে সেখানে সেখানেই আধ্যাত্মিক ভিত্তি রয়েছে এমনটা আমরা বলতে পারি। ভারতে গৃহব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থার মূল অধিষ্ঠান অধ্যাত্মই বটে। তাই আধ্যাত্মিক অর্থশাস্ত্র বলার ক্ষেত্রে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

ভারতের যুগ যুগের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ব্যবস্থাসমূহকে এত উত্তমরূপে প্রস্তুত করেছে এবং আচরণসমূহকে এতটাই অর্থপূর্ণ ও মানবিকভাবে তৈরি করেছে যে সে বিশ্বের মাঝে দীর্ঘজীবী এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে। এই দূরদৃষ্টির জন্য ভারতের প্রত্যেকটি ব্যবস্থায় সমরসতা দৃষ্ট হয়, কারণ সর্বত্র আত্মতত্ত্ব ব্যাপ্ত হওয়ার দরুণ সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত এমনটাই প্রতীত হয়। সামগ্রিকতায় বিচার করার কারণে এবং তার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাবলী প্রস্তুত করবার জন্য ন্যূনতম জটিলতার সৃষ্টি হয় এটাই ব্যবহারের নিয়ম।

বর্তমান বৌদ্ধিক বিভ্রমের পরিণামস্বরূপ আমরা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এমন দুটো বিভক্ত করে থাকি এবং প্রত্যেকটি অবস্থানকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দেখে থাকি। আমাদের বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা এখানেই যে আমরা যা ভৌতিক নয় তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক কিন্তু যা আধ্যাত্মিক তা ভৌতিক নয় এমনটা মনে করি। বাস্তবে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এমন দুটো বিভাগই নেই। ভৌতিকের ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিক। এজন্যই বিচার্য হয় আধ্যাত্মিক, নয়তো অনাধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক অথবা ভৌতিক হয় না। কারণ স্পষ্ট। আধ্যাত্মিকের ব্যক্ত রূপই হচ্ছে ভৌতিক। এজন্যই যেভাবে আধ্যাত্মিক অর্থশাস্ত্র হয় সেভাবেই আধ্যাত্মিক ভৌতবিজ্ঞানও সম্ভব।

ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে পশ্চিম অনাধ্যাত্মিক ভৌতিক, অপরদিকে ভারত হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভৌতিক। আধ্যাত্মিক ভৌতিক হবার কারণে ভারতে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও বিকশিত হয়ে থাকে যখন কিনা পশ্চিমে সংস্কৃতি ছাড়াই সমৃদ্ধি সম্ভব হয়ে থাকে। সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিকে একই সঙ্গে প্রাপ্ত করবার জন্য আধ্যাত্মিকতার সমপর্যায়ে দাঁড়াবার মতো তাদের কোনো দূরদৃষ্টি বা দর্শন নেই।

ভারতের বৌদ্ধিক জগতের জন্য এই আধ্যাত্মিক ও ভৌতিকের সমন্বয় স্থাপন করাই হচ্ছে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কয়েক প্রজন্ম ধরে বৌদ্ধিক ক্ষেত্র এবং তার মূলে থাকা শিক্ষাক্ষেত্র উলটো অভিমুখে চলেছে, সেজন্য এটা কঠিন তো বটেই কিন্তু অনিবার্যরূপে করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭. সংস্কৃতি

সংস্কৃতির অর্থ হচ্ছে জীবনশৈলী। সংস্কৃতি শব্দের সম্বন্ধ ধর্মের সঙ্গে রয়েছে। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বনিয়ম। ধর্ম হচ্ছে একটা সার্বভৌম ব্যবস্থা। সংস্কৃতি হচ্ছে তার অনুসরণে কৃত কর্ম। সংস্কৃতি ধর্মের একটি প্রণালী বা পদ্ধতি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আচরণ করে করে সকল অধিবাসীর যা রীতিতে পরিণত হয়েছে সেটাই হচ্ছে সংস্কৃতি। ভারতের অধিবাসীদের যে জীবনরীতি সেটাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি।

আজ ধর্মের দিকে সংস্কৃতির মনোযোগ নেই এবং শুধু রীতিসমূহকে সংস্কৃতি বলা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ রঙ্গমঞ্চে যে নাটক, নাচ, গান ইত্যাদি হয় তাকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বলা হয়ে থাকে। বিদেশে দেশের সাংস্কৃতিক দল গেলে তাতে গায়ক ও নর্তক থাকে। বেশভূষা, খাবারদাবার, অলংকারের প্রদর্শন ইত্যাদিকে সাংস্কৃতিক প্রদর্শন বলা হয়ে থাকে। এসব কিছু সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও শুধু এটাই সংস্কৃতি নয়।

অন্ন, গোরু, তুলসী, জল ইত্যাদিকে পবিত্র জ্ঞানে যে ব্যবহারের নিয়ম বা রীতি নির্মিত হয় সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা খাবার খেতে বসলে তখন যদি কেউ আসে তাকেও খাবার জন্য বসানো এটা আমাদের

সংস্কৃতি। পূর্বসূচনা ছাড়া কেউ এলে তাকে খাবার জন্য জিজ্ঞেস করবার আবশ্যকতা নেই এবং আগন্তুকও এমনটা আশাও করে না, এটা হচ্ছে পশ্চিমের সংস্কৃতি।

কেবল কলাকৌশলই সংস্কৃতি নয়, বরং অধিবাসীদের জীবনদর্শন যে পদ্ধতিতে, যে রূপে কলাকৌশলের মাধ্যমে ফুটে ওঠে সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি। উদাহরণ : সংস্কৃতে মহাকাব্য ও মহানাটক কখনও দুঃখান্ত হয় না, কেননা জীবনের বিধায়ক দৃষ্টিকোণ কাব্যে প্রস্ফুটিত হওয়া দরকার এমনটাই সর্বমান্যতা রয়েছে। 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'--- এই সূত্র সকল কলাকৃতিতে প্রস্ফুটিত হওয়া দরকার বলে মনে করা হয়। 'কলার জন্য কলা'—এই সূত্র ভারতীয় সাহিত্যে মান্য নয়। সাহিত্যের প্রয়োজন জীবনধর্মী হওয়া দরকার।

ইতিহাস কেন পড়া দরকার? আজকের মতো শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা মানা হয় না। সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাঠই আবশ্যক বলে মনে করা হয় কেননা ইতিহাস থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদির জন্য কেমন ব্যবহার করা দরকার আর কেমনটা নয় তার প্রেরণা ও উপদেশ পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ভূগোল তাকে বলে যেখানে ভূমির সঙ্গে ভাবাত্মক সম্বন্ধ জুড়ে থাকে। সাংস্কৃতিক সমাজশাস্ত্র তাকে বলে যাতে ধর্মরক্ষার জন্য তার অনুসরণ হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক ধর্মশাস্ত্র তাকে বলে যেখানে ধর্মের অবিরোধী অর্থার্জন হয়ে থাকে। তাৎপর্য হচ্ছে, এই যে সংস্কৃতি কেবল কলাই নয়, বরং তা হচ্ছে জীবনশৈলী।

'মাতৃ দেবো ভব, পিতৃ দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব, আচার্য দেবো ভব'— এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির আচার। যুদ্ধ করবার সময়ও ধর্মকে ছাড়া যাবে না — এটাই ভারতের রীতি। ভূত মাত্রেরই কল্যাণ চাওয়া ভারতীয় সংস্কৃতির রীতি। ভোজ্যকে ব্রহ্মরূপে গণ্য করে তা জঠরাগ্নিতে আহুতি দেওয়া রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির রীতি।

ধর্ম ও সংস্কৃতি একই সঙ্গে প্রযুক্ত

হওয়ার সংজ্ঞার অর্থ এই যে সংস্কৃতি ধর্মকে অনুসরণ করে থাকে। সংস্কৃতিতে আনন্দের ভাবও জড়িয়ে থাকে। জীবনে যখন আনন্দের অনুভব হয় তখন তা নৃত্য, সংগীত, কাব্য ইত্যাদির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। সৌন্দর্যের অনুভূতি বস্ত্রালংকার, শিল্পস্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। এজন্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে রস আছে, আনন্দ আছে, সৌন্দর্য আছে। জীবনে সত্য এবং ধর্মের অভিব্যক্তিকেও সুন্দর করে তোলা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি।

৮. সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্বন্ধ

নেপোলিয়ন ১৫৩ সেমির একজন খাটো মানুষ ছিল। একবার তিনি নিজের থেকে উঁচু স্থানে থাকা কোনো বস্তুকে তিনি দেখলেন এবং তার প্রতি দৃষ্টিকে স্থির করলেন। অভিপ্রায় বুঝে তার পেছনে দাঁড়ানো সহকারী হৃষ্টপুষ্ট একজন সৈনিক তৎক্ষণাৎ ওই জিনিসটিকে এনে তার কাছে দিল এবং মশকরা করে বলল, আপনার চেয়ে আমি উঁচু। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলির মতো উত্তর বেরিয়ে এল, 'লম্বা বলো, উঁচু বোলো না।' সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিবেচনা করবার সময় এই ছোট্ট প্রসঙ্গের কথাটা মনে পড়ে যায়। তাৎপর্য হচ্ছে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে উঁচু এবং সভ্যতা হচ্ছে দীর্ঘ।

আদি শংকরাচার্যের নির্বাণাষ্টকে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন একটি শব্দ হয়েছে 'নিরাকার রূপ'। নিরাকারের রূপ কী করে হতে পারে? কিন্তু নিরাকারিতাই যার আকার তা অন্য শব্দ দ্বারা কী করে বলা যায়? সংস্কৃতিও এই শ্রেণীতে এসে থাকে। এটা নিরাকাররূপী। অতএব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা এবং পরীক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু সভ্যতা তার পরিচায়ক ছোটো বড়ো বস্তুরূপে দৃষ্টিগত হয়ে থাকে। এটাও মানুষের প্রকৃতি। সাধারণ মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি হওয়া কঠিন। আবার স্থূলদৃষ্টি হওয়া সহজ। এজন্য সংস্কৃতির ওপরে মাপদণ্ড কম মনে হয়। অপরদিকে সভ্যতার ওপর অধিক মনে হয়।

রামেশ্বরম, চিদম্বরম, শ্রীরঙ্গম, মাদুরাইয়ের মতো প্রাচীন মন্দিরগুলোর কথা ভাবুন। সর্বত্রই ওখানকার গগনচুম্বী গোপুরম্, স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া, সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ ইত্যাদির চাকচিক্য বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মন্দিরের মূর্তির বর্ণনা অল্পই পওয়া যায়। অথচ ওই ছোট্ট মূর্তিকে ছাড়া মন্দিরের কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর কথাই বিস্মৃত হয়ে থাকে আর চূড়ার বর্ণনা থেকে যায়। বাস্তবে সংস্কৃতির স্থান হলো মূর্তির মতো, মূর্তি ও সভ্যতার স্থান হচ্ছে শিখরের। যেমন মূর্তি ছাড়া মন্দির চূড়া চিন্তাও করা যায় না, ঠিক তেমনই সংস্কৃতি ছাড়া সভ্যতা অসম্ভব। সংস্কৃতিহীন সভ্যতাকে অসভ্যতা বলতে হবে। এটা মানুষকে বিকৃত অভিমুখে চালিত করবে এবং তাকে নিঃশেষ করবে।

সভ্যতার বিকাশ কীভাবে হয়? সভ্যতার বীজ হলে সংস্কৃতি। সাধারণত মানুষ সংস্কৃতির প্রেরণায় ঊর্ধ্বে যেতে চায়, নীচে পড়তে চায় না। উঁচুতে ওঠার কাজ হলো পাহাড়ে ওঠার কাজ। নিজেকে সামলে সাবধানতার সঙ্গে একটু একটু করে ওপরে উঠতে হবে। এজন্য মানুষ সতর্কতার সঙ্গে নিজের কাছে যেটুকু প্রয়োজনীয় সামগ্রী রয়েছে তার দ্বারা সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে থাকে। ধীরে ধীরে সে পাথরের ওপর লাগায়। অনুরূপভাবে সংস্কৃতির মূল্য ধরে উৎকৃষ্টতার দিকে যাবার জন্য মানুষ নানা প্রকারের প্রয়াস করে থাকে। তা থেকেই সভ্যতা জন্ম নিয়ে থাকে।

সংস্কৃতি যা হচ্ছে নিরাকাররূপী, তাকে তুলে ধরতে কোনো মাধ্যম চাই, যেমন বিদ্যুৎকে উপস্থাপনা করতে ও প্রয়োজক তৈরি করবার জন্য অন্যান্য মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে থাকে। ওই মাধ্যম দু' প্রকারের হয়ে থাকে--- গুণাত্মক ও রূপাত্মক। আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য,

পরম্পরা, রীতিনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি হচ্ছে গুণাত্মক মাধ্যম। এর কোনো স্থূলরূপ নেই, তথাপি তা হচ্ছে প্রভাবশালী মাধ্যম। একে ব্যবহারে আনবার জন্য প্রাণময় মাধ্যম হচ্ছে আচার্য, দার্শনিক, মহাপুরুষ, নেতাগণ, চরিত্রবান সজ্জনগণ প্রভৃতি এবং বস্তুনির্মাণ, বস্তুসংগ্রহ ইত্যাদি হচ্ছে অন্য প্রকারের মাধ্যম। কর্মেন্দ্রিয় হচ্ছে বিজ্ঞান, শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুকলা, হস্তশিল্প, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি।

উপযুক্ত মাধ্যমগুলোর দ্বারা তার কর্মশীল সহায়ক সমূহের সহযোগে যখন সংস্কৃতি অধিকাংশ উন্মোচিত হয়ে যায় তখন ওই বিশেষ অবস্থাকে বলে শুচিতা। শুচিতা সাংস্কৃতিক মূল্যগুলোর মধ্যে একটি। এটি মানুষের অনিবার্য গুণ। তার জন্য নিজের আবাসস্থল স্বচ্ছ থাকা আবশ্যক। তার জন্য মানুষের আগেকার দিনগুলোতে ঘোড়ার মতো পশুর লেজ দিয়ে ঝাঁট দিয়ে থাকতে পারে। অথবা জঙ্গলের গাছের ছাল অথবা পুরাতন ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মুছে দিয়ে থাকতে পারে। ধীরে ধীরে সে কেবল ওই কাজের জন্য একটি মাধ্যমের আবিষ্কার করল এবং পরিষ্কার করবার জন্য ঝাঁটা নামের একটা মাধ্যম আবির্ভূত হলো। জঙ্গলে ও নিজের গ্রামে উপলব্ধ জিনিস দ্বারা মানুষ ঝাঁটা বানানো শুরু করল। শুচিতাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য এক বিশেষ মাধ্যম মানুষের জীবনে প্রবেশ করল। বিদ্যুৎ এল, বিজ্ঞান সামনে এগিয়ে চলল এবং ঝাঁটার বদলে এল ডাস্টার। ঘোড়ার লেজ থেকে ডাস্টার পর্যন্ত যাত্রা সভ্যতার হয়েছে। এই সভ্যতার প্রাণরূপী সাংস্কৃতিক মূল্য শুচিতা যা কখনও বদলায়নি, স্থির রয়েছে।

শুচিতা নিয়েই এগোনো যাক। ব্যক্তিগত জীবনে শুচিতার জন্য প্রয়োজন স্নান। পশু-পাখিও স্নান করে থাকে। কিন্তু মানুষ স্নানকে একটা বিশেষ স্থান দিয়েছে এবং নিয়মিত স্নান তার জীবন পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। প্রারম্ভিক দিনগুলোতে তারাও পশুদের মতো যেখানে পৌঁছেছে সেখানে স্নান করে থাকতে পারে। যখন যখন মনে হয়েছে তখন তখন করে থাকতে পারে। স্নানের সময়ের নিয়মিততা নাও থাকতে পারে। জীবন সুব্যবস্থিত করার অন্তঃপ্রেরণা থেকে ধীরে ধীরে সে ব্যবস্থা করল। তারা নদীর ধারে আসতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে তারা ব্যবস্থায় সংশোধন এনে ঘাট বানালো, ঘাটে সিঁড়ি তৈরি করল। এর নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিয়ে লোকোপকারের কারণে লোকপ্রিয় উদার মনোভাবাপন্ন মানুষ নিজের আবাস থেকে বহুদূরে হলেও দীর্ঘকায় ঘাট তৈরি করল। বাস্তুকলার বিকাশ হতে হতে তারা স্নান করবার আলাদা ব্যবস্থা বাড়ির পাশে বানালো। পুকুরের সৃষ্টি হলো, কূপের সৃষ্টি হলো। বিজ্ঞান এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরে স্নান করবার জন্য বাড়ির ভেতরে নলবাহিত জল আসতে শুরু করল। এখন গঙ্গা থেকে শত মাইল দূরের শহরে মানুষ নিজের শয়নকক্ষের সঙ্গে সংলগ্ন স্নানাগারে গঙ্গা জলে স্নান করে থাকে। এখানে অপরিবর্তিত মূল্য হচ্ছে শুচিতা। তার জন্য যে ব্যবস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বানানো হলো তা পরিবর্তিত হতে থাকল। এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার মূলত মানুষের কল্পনাপ্রসূত। এজন্য নতুন নতুন নির্মাণ হতে লাগল। নতুন নতুন ব্যবস্থা আসতে থাকল, তা সমাজব্যাপী হতে থাকল। সাধারণ মানুষ তাতে অধিক সুবিধা অনুভব করতে লাগলো। ওই মানগোষ্ঠীর প্রয়াসের পরিণতি দৃষ্টিগোচর হলো। এই প্রক্রিয়াকে সভ্যতা বলে।

শুচিতার সমান আরও দুটো গুণ আছে তা হচ্ছে দয়া ও দান। ভিক্ষুককে ভিক্ষে দেওয়া, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া, অসুস্থকে সেবা করা ইত্যাদি মানবিকতার সঙ্গে সম্পাদন করা হচ্ছে সুসংস্কৃত মানুষের কর্তব্য। ভারতের সমস্ত গৃহবাসী এই কর্তব্যগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করতে থাকল। ধীরে ধীরে সে সমমানসিকতাসম্পন্ন সঙ্গীদের সাহায্যে অধিক মানুষ তাদের এই সেবার লাভ পাক এই দৃষ্টিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সংস্থাসমূহ তৈরি করতে থাকল। তার মধ্যে সার্বজনিক কূপ, লঙ্গরখানা, চিকিৎসালয়, অনাথালয়, ধর্মশালা ইত্যাদির নির্মাণ হলো। ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই এটা চলে আসতে লাগল। আচার্য চাণক্যের গ্রন্থে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তেমনিভাবে এখানে আগত বিদেশি যাত্রীদের অভিজ্ঞতার বর্ণনাতেও পর্যাপ্ত মাত্রায় পাওয়া যায়। তা থেকে উপলব্ধি হয় যে, ভারতের সভ্যতা উচ্চমানের ছিল। এরকমটাই হচ্ছে বিদ্যাদান করবার গুণ। তার জন্য আদিস্থান ছিল গুরুগৃহ। ক্রমশ গুরুকুল বিকশিত হলো। বড়ো বড়ো বিদ্যালয় নির্মিত হলো। সমাজ থেকে প্রাপ্ত ধন থেকে শত শত আচার্যের অধ্যাপনায় সমৃদ্ধ নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, কাঞ্চীপুরমের মতো বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উদয় হলো। এর উল্লেখ করবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত ইতিহাসকারগণের মত হলো যে, তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতা অপ্রতিম ছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ওপরে কেবল চারটি গুণের কথা আলোচনা করেছি। এভাবেই সমস্ত গুণের বিকাশ সভ্যতার দিকে নিয়ে চলেছে। সভ্যতার এই বিকাশ সংস্কৃতিকেও বিকশিত করে থাকে। যখন দান, দয়া, শুচিতা, বিদ্যাদান প্রভৃতি গুণ ব্যক্তিগত থাকে তখন ওই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ পরোপকারের মাধ্যমে পুণ্যার্জন হয়ে থাকে। দানের মাধ্যমে স্বর্গলাভের উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু তার জন্য করা ব্যবস্থা যখন বৃহদাকার হয়, সামগ্রিক সহযোগিতার হয় তখন সহযোগীদের দৃষ্টিকোণ ব্যক্তিগত পুণ্য থেকে ওপরে উঠে ব্যক্তি নিরপেক্ষ সমষ্টিগত পুণ্যের হয়ে যায়। তখন সমষ্টির উদ্ধার হয়ে থাকে। বাস্তবে এটাই হচ্ছে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্বন্ধ। সংস্কৃতির কারণে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সভ্যতা জনকল্যাণকারী অভিমুখে বিকশিত হয়ে যায়, আবার বিকশিত সভ্যতার জন্য চিরন্তন মূল্য দ্বারা সংস্কৃতি সার্বজনিক হয়ে যায়। (ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

বিশেষ প্রতিবেদন

নিট-জেইই এন্ট্রান্স টেস্ট বাতিলের দাবি এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি

ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ

বর্তমান সময়ের অন্যতম উত্তপ্ত সংবাদ ন্যাশানাল ট্রেনিং এজেন্সি পরিচালিত 'নিট-জেইই এন্ট্রান্স টেস্ট ২০২০'। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও মেনস্ট্রিম মিডিয়ায় নানা বিতর্ক হয়ে চলেছে। 'নিট' হলো ন্যাশানাল এসিজিবিলিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (আন্ডার গ্রাজুয়েট) এমবিবিএস ও বিডিএসে সরকারি ও প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সর্বভারতীয় স্তরের একমাত্র পরীক্ষা। আগে এর নাম ছিল এআই পিএমটি (অল ইন্ডিয়া প্রি মেডিক্যাল টেস্ট)। অন্যটি হলো জেইই (জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সজামিন) টেস্ট , সর্বভারতীয় স্তরের বিটেকে ভর্তি হওয়ার জন্য অর্থাৎ আইআইটি, এনআইটি, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষা। জেইই পরীক্ষাটি দুটি স্তরে হয়ে থাকে, জেইই মেন এবং জেইই অ্যাডভান্স। শেষেরটি আইআইটি-তে প্রবেশের চূড়ান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা। ২০১৯ সাল থেকে এআইপিএমটি ও জেইই-কে অধিকতর সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুটিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির অধীনে। বর্তমানে দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার জন্য একমাত্র সংস্থা এবং সংবিধানগত ভাবে সর্বোপরি। এবছর এনটিএ পরিচালিত এই পরীক্ষা প্রতি বছরের জন্য এপ্রিল মাসে হওয়ার ঠিক ছিল কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করে প্রথমে জুলাই মাসে নির্ধারিত হয়, আবার একই কারণে বাতিলও হয়ে যায়। শেষপর্বে সরকার ইউজিসি এবং সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল সংস্থাগুলি অনেক ভেবেচিন্তে আলোচনার পর চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা করে এবছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বরের তারিখে জেইই মেন, ২৭ সেপ্টেম্বর জেইই অ্যাডভান্স। এই পরীক্ষাগুলি সবই নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অনলাইনে নেওয়া হবে।

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্তে অবিচল। অভিভাবকরা এক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন, সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচারের প্রতারণার শিকার হবেন না এবং রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

অন্যদিকে ১৩ সেপ্টেম্বর এমবিবিএস ও বিডিএস প্রবেশিকা নিট নেওয়া হবে। এই পরীক্ষাটি কাগজে-কলমে হয়ে থাকে। টেস্ট গ্রহণ পরীক্ষা থেকে পঠনপাঠন শুরু আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে না হতে পারলে এক পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরো শিক্ষাবর্ষ হয়ে উঠবে যার খেসারত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণকালে ও পরবর্তী কর্মপ্রার্থীরূপেও অত্যন্ত একবছর পিছিয়ে থেকে শুরু করার মধ্য দিয়ে।

কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনায় এনটিএ এবং সরকারের পরিকল্পনায় কোনো খামতি নেই। পাবলিক ডোমেনে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে বর্তমানে সারা দেশে এমবিবিএস পড়ার জন্য ৫৩৯টি কলেজ রয়েছে যার মধ্যে ২৭৯টি সরকারি এবং ২৬০টি বেসরকারি, মোট আসন সংখ্যা ৭৬৯২৮টি। আরও বেশি সংখ্যক প্রার্থীকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকার এই সংখ্যা বর্তমান বছরে ১৫০০০-এর মতো বাড়িয়ে প্রায় ৯০০০০

করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । ডাক্তারির পোস্টগ্রাজুয়েট এবং ডিএম ডিগ্রির জন্য ২০৪টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এই ক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রী ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে পিজিতে ১৭০০টি আসন বাড়িয়ে ৩২১৫৮টি এবং ডিএমে ৪০৭টি আসন বাড়িয়ে ৩২০৪টি আসন করা হয়েছে। সুতরাং তুলনামূলক বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে সুযোগ করে দেওয়ার সরকারের সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত।

এনটিএ-র প্রকাশিত নোটিফিকেশন থেকে জানা যাচ্ছে ২০২০ সালের মোট জেইই প্রার্থী ৮.৫৮ লক্ষ এবং নিট পরীক্ষার্থী মোট ১৫.৯৭ লক্ষ। এরজন্য পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়িয়ে জেইই-তে ৫৭০ থেকে ৬৬০ এবং নিটে ২৫৪৬ বাড়িয়ে (৫০ শতাংশে) ৩৮৪৩ করা হয়েছে যাতে কোভিড পরিস্থিতিতে বেশিসংখ্যক পরীক্ষার্থী নিজ নিজ বাসস্থানের কাছাকাছি কেন্দ্র পেতে পারে। এই মুহূর্তের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে উভয় পরীক্ষায় এ পর্যন্ত ১৭ লক্ষের মতো প্রার্থী অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে ফেলেছে এবং ৯৯ শতাংশ প্রার্থী নিজ পছন্দমতো পরীক্ষাকেন্দ্র পেতে সক্ষম হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিওয়াল জানাচ্ছেন, জেইই-তে ৯৯.০৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী প্রথম পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়েছে। মাত্র ১২০ জন পরীক্ষা কেন্দ্র বদলের অনুরোধ করেছে। এদিকে নিট-এর ক্ষেত্রে ৫ বার পরীক্ষা কেন্দ্র বদলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং পরিসংখ্যান জানাচ্ছে যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত ৯৫০০০ জন প্রার্থী করেছে, এখন আরও ৯৮.৮৭ শতাংশ তাদের প্রথম পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়ে গেছে। সুতরাং এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান যে সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা মন স্থির করে ফেলেছে।

এনটিএ জানাচ্ছে পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে— ১০ লক্ষ মাস্ক, ১০ লক্ষ গ্লাভস, ১৩০০ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার গান, ৬৬০০ মিটার হ্যান্ড সানিটাইজার এবং সমসংখ্যক ডিসইনফ্যানট্যান্ট, ৬৬০০ স্পঞ্জ, ৩৩০০ স্প্রে বোতল এবং ৩৩০০ জন সাফাই কর্মী। ফলে বাড়লো অতিরিক্ত খরচ ১৩ কোটি টাকা। এর জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে ১৫০ টাকার পরিবর্তে ৪০০ টাকার করে নেওয়া হবে। ৮.৫৮ লক্ষ জেইই পরীক্ষার্থীর জন্য ১.১৫ লক্ষ ইনভিজিলেটর নিয়োগ করা হয়েছে। পরীক্ষার শিফট সংখ্যা বাড়িয়ে ১২টি করা হয়েছে। শুরু হবে সকাল ৯-৩০ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত, মাঝে স্যানিটাইজ করার জন্য যথেষ্ট সময় রেখে পরবর্তী ক্ষেত্রে বিকেল ৩টে থেকে করা হয়েছে। আসন বিন্যাস সোশ্যাল দূরত্ব রাখতে অলটারনেট আসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, হল প্রতি ১২ জন করে পরীক্ষার্থী। প্রার্থীদের আরোগ্য সেতু অ্যাপ সচল ও সক্রিয় রাখতে বলা হয়েছে। প্রবেশের সময়, দস্তাবেজ চেক ও সিকিউরিটি চেক সবই স্পর্শবিহীন ভাবে সম্পন্ন হবে এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের চূড়ান্ত সতর্কতা রাখা হবে। এনটিএ এবং ইউনিয়ন এডুকেশন মন্ত্রী সমস্ত রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরিবহণ ব্যবস্থা সুষ্ঠ ও যথাযথ করেছে। অতএব ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক। পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয় পক্ষই অনুকূল মানসিকতায় থাকবে সেক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়?

সমস্যাটা দেশের রাজনীতির ধারক বাহকদের। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক চাইছে না এই পরীক্ষা গ্রহণ সেপ্টেম্বর ২০২০-তে বাতিল ঘোষণা করা হোক। বাতিলের এই দাবি উঠেছিল বিরোধী দলের রাজনীতিকদের তরফ থেকে। বিরোধীদল পরিচালিত ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও একই দাবি করছিলেন। এর একটা সম্ভাবনা মনে করা হচ্ছে যে, প্রায় ১ কোটির মতো এই পরীক্ষার্থী আগামী নির্বাচনে ভোটার হয়ে উঠবে তাদের তুষ্ট করার এটা একপ্রকার প্রচেষ্টা হতে পারে। আর একটি কারণ অর্থ ও ব্যবসা। এক্ষেত্রে এক বিশাল 'নেক্সাস' কাজ করছে। ১৯৯৬-১৯৯৮ সালের মধ্যে সারাদেশে বহু বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলেছে, যেগুলি নির্মাণে প্রচুর অর্থ দরকার হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বাম নেতাদের অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ ব্যয় করে এগুলি গড়ে উঠেছে। পরীক্ষা গ্রহণ বাতিল করাতে পারলে লোকসানের জিগির তুলে শূন্য আসন ভরাটের দাবি করে ছাত্রদের থেকে মোটারকম অর্থের বিনিময়ে আসন বেচতে আরম্ভ করবে, একপ্রকার পূর্ণ মাফিয়াগিরি। নিরাপত্তার জন্য কোভিড-১৯-এর কারণে বহু স্কুল বোর্ড ১২ ক্লাসের পরীক্ষা নিতে সক্ষম হয়নি, সেক্ষেত্রে তাদের 'ইন্টারন্যাল অ্যাসেসমেন্ট' থেকে ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের জন্য এই ফলাফল ভর্তির মানদণ্ড হতে পারে না। কারণ, দেখা গেছে গত বছরগুলির পরীক্ষার সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, ১২ ক্লাসে ভালো ফলাফল না করেও পরীক্ষার্থী জেইই ও নিটে সফল হয়েছে। সুতরাং এই কারণেও এইসব যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হোক এনটিএ এবং সরকার হতে দিতে চায় না।

অন্যদিকে মিডিয়ার এক বড়ো অংশ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা ক্রমাগত প্রচার, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, পরীক্ষা বাতিলের আবদার ও সিদ্ধান্ত স্বপক্ষে না গেলে আত্মাহুতি দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে ছাত্রদের ভূমিকা কতটা রয়েছে? প্রকৃত পরীক্ষার্থীদের ফেসবুক ও টুইটার দেখা দরকার, তাদের মিছিল মিটিং অবস্থান ইত্যাদি করার সময় কোথায়? তারা তো পড়াশুনায় ব্যস্ত রয়েছে। তবে ছাত্র নামধারী এরা কারা? একটু তলিয়ে দেখলেই পাওয়া যাচ্ছে এরা আদৌও ছাত্র নয়। ফেসবুক পোস্ট, টুইট সব নকল, টুইটগুলি ও টুইট করনেওয়ালারাও। অনুসন্ধান থেকে জানা যাচ্ছে এগুলি অধিকাংশ কংগ্রেস, তৃণমূলের আইটি সেল দ্বারা করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টগুলির ছবি দেওয়া হচ্ছে না, পরিচয় গোপন রাখলেও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অনেক সাংবাদিকও এতে জড়িত। সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলি রাজনৈতিক দলের আইটি সেলের দ্বারা বলে ধরা পড়ছে। রিটুইটগুলিও কংগ্রেসের আইটি সেলের অথবা ভাড়াটে কেউ, টুইট প্রতি ২ টাকা করে পাওয়া যায় নাকি। প্রচারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু পুরানো, যেমন— হাতের শিরা কেটে আত্মহননের প্রচারটি ২০১৬ সালের, বন্যার ছবি ২০১৭ সালের এবং ধরনা প্রদর্শন ২০১৮ সালের মার্চ মাসের। নকল

পোস্ট করতে গিয়ে দিশেহারা ও দেউলে অবস্থা দেখা গেছে, যেমন একটি ছাত্রীর ফেসবুক পোস্টে পরীক্ষা বাতিলের আবদার তার বাবার করোনায় আক্রান্ত নিয়ে, কিন্তু প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা মেডিক্যাল প্রমাণ পত্রটি পাকিস্তানের লাহোরের হাসপাতালের।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সুপ্রিমকোর্টে পরীক্ষা বাতিলের রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিলেন। যদি ইতিমধ্যে সুপ্রিমকোর্ট আগেই ১১ জন ছাত্রের (?) এই ধরনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিরোধী রাজনীতিকরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে যে এইসব ক্ষেত্রে ফেডারেল নীতি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের মতামত জানা যাক— 'সংবিধানের আর্টিকেল ১(১)-এ বলা হচ্ছে 'India, that is Bharat, shall so a Union of States'। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লোকসভায় বিআর আম্বেদকর জানিয়েছেন, এই ইউনিয়ন কোনো চুক্তি থেকে হয়নি, রাজ্যের কোনো স্বাধীনতা নেই পৃথক সত্তা দাবি করার, রাজ্যের ভূমিকা বাস্তবে নগণ্য। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মামলায় সুপ্রিমকোর্ট জানিয়েছিল রাজ্য মোটেই 'Union of soveriegn' নয়। অর্থাৎ 'more unitary than federal'।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক পরিকাঠামো কেমন সংক্ষেপে দেখা যাক। ভারত ভিন্নতা বিশিষ্ট দেশ হলেও এর শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু জটিল নয়। 'ন্যাশনাল পলিশি অন এডুকেশন' শিক্ষা বিষয়টিকে যুগ্ম তালিকায় স্থান দিয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে নীতি নির্ধারণ হয় এবং পারস্পরিক দায়িত্বে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ ঘটেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন এজেন্সি ও আমলাদের মধ্যে লড়াই ঘটে চলেছে।

চূড়ান্ত ভণ্ডামি দেখা যাচ্ছে বিরোধীদল পরিচালিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে। রাজস্থানে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে একাধিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ও হবে। পিটিআই জানাচ্ছে, এখন থেকেই ওই রাজ্যে সমস্ত ধর্মীয় স্থান উন্মুক্ত করা হলো (কোনো সংক্রমণের ভয় নেই এখানে), শুধুমাত্র নিট-জেইই পরীক্ষার ক্ষেত্রেই সংক্রমণের আশঙ্কা কেন? অর্থাৎ লক্ষ্য রাজনীতি, ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা। ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সরকার পরীক্ষা গ্রহণের সময় পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেও পরীক্ষা চলাকালীন সুষ্ঠ পরিবহণের ব্যবস্থার নিশ্চয়তা ঘোষণা করেছে এবং হোটেল ইত্যাদিও খোলা রাখার আবেদন করা হয়েছে। সুতরাং পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়েই হবে।

দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তারা, যেমন আইআইটি দিল্লির ডিরেক্টর ডি. রামগোপাল রাও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ফেসবুক পোস্টে অনুরোধে জানাচ্ছেন, পরীক্ষা বাতিল করে পরে নেওয়া হলে মেধাবী ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বড়ো ধাক্কা লাগবে, জিরো শিক্ষাবর্ষ হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর কোভিড থাকবে, কিন্তু ক্যারিয়ার বসে থাকবে না, লকডাউনের চিরস্থায়ী অবস্থায় অপেক্ষা করা অনুচিত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তিনি আরও জানাচ্ছেন, পরীক্ষা গ্রহণের পর ফলাফল, ভর্তি ও অনলাইনে পড়াশুনা শুরুর সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়ে আছে এই ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষাবর্ষ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে আইআইটি দিল্লিতে একসঙ্গে দুটি ব্যাচের স্থান সংকুলান অসম্ভব, চূড়ান্ত চাপ হয়ে যাবে, পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে যাবে। ফলস্বরূপ পঠনপাঠনের গুণমান অধোগামী হয়ে উঠবে। পরীক্ষা নিয়ে টিভি বিতর্কগুলির সমালোচনায় তাঁর মন্তব্য এগুলির 'উত্তাপ বেশি কিন্তু আলো কম এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা মেরুকৃত, এর থেকে তফাতে থাকাই শ্রেয়'– নিষ্ঠাবান ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাঁর এই নির্দেশ। একই মতামত দিয়েছেন গুয়াহাটি ও রোপারের আইআইটি-র অধিকর্তারা।

স্বল্পবুদ্ধির রাজনৈতিক নেতারা অসম ও বিহারের বন্যার অজুহাতে পরীক্ষা বাতিলের দাবি এনেছেন, কিন্তু বন্যার ঘটনা এই দুই রাজ্যে ফি বছরের খবর। তামিলনাডু ও দিল্লির শাসকরা বাতিলের পক্ষে যদিও অন্যসব ক্ষেত্রে তারা ইতিমধ্যে উন্মুক্ত করার নির্দেশ জারি করে চলেছেন। অন্যদিকে, দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ১৫০ জন শিক্ষাবিদ প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিয়ে সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে হচ্ছে, ১৯৭৫-১৯৭৬ সালের জরুরি অবস্থা কালের প্রথম দিককার ঘটনা। কিছু করে দেখানোর তাড়নায় প্রশাসন মন্দের ভালো সত্তরের দশকের ব্যাপক গণটোকাটুকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে খেদাতে সক্ষম হয়েছিল। 'যুগ যুগ জিও', চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' ও শিক্ষাঙ্গনে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানের কিছুদিনের জন্য হলেও পিণ্ডি চটকে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থতা ফিরে এনেছিল। যারা গণটোকাটুকি পন্থী ছিল, পরীক্ষা বাতিলের দাবি ও হুমকি দিয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষামুখী হওয়ায় তারা গুটিয়ে যায়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা চিরকালই অন্তত ভবিষ্যৎ গড়ার স্বার্থে পড়াশোনা ও পরীক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এখনও তাই করবে। একটা ঘটনা আমাদের ছাত্র থাকাকালীন যা হয়ে রয়েছে, ক্রমাগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে পড়া, আমাদের ফেল না করেও প্রায় ২ বছরের মতো সমস্ত ছাত্রজীবন। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলি এরজন্য ভুল স্বীকার করেনি, ক্ষমা প্রার্থনাতে দূরের কথা। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানের ছাত্রদের সতর্ক করে দিতে চাই কখনও শিক্ষাবর্ষ নষ্ট অথবা পিছিয়ে দেওয়ার ফাঁদে পড়বে না।

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্তে অবিচল। অভিভাবকদের এক্ষেত্রে সতর্ক করা হচ্ছে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচারের প্রতারণার শিকার হবেন না এবং রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ■

বিশেষ নিবন্ধ

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে

চীন গরিব দেশগুলোকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এমনকী ঋণগ্রস্ত দেশের ভূমি পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা বন্দর ৯৯ বছর লিজে দখল নেওয়া তারই উদাহরণ। এভাবে আফ্রিকান দেশ জিবুতিতে গড়ে তুলেছে সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন হাম্বান টোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দেওয়া ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত'।

প্রথম পর্ব

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। এক সময় 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' স্লোগানটি খুব জনপ্রিয় ছিল এই উপমহাদেশে, বাংলাদেশেও। এখন সেই স্লোগান দুর্বল হয়ে পড়েছে, শোনা যায় না। তবে বিশ্বজুড়ে নতুন স্লোগান উঠে আসছে--- 'চীনা সাম্রাজ্যবাদ রুখে দাঁড়াও'। চীন যেভাবে থাবা বিস্তৃত করছে, শক্তি দিয়ে কিংবা ঋণের জালে আবদ্ধ করে একের পর এক ভূখণ্ড দখল করছে, দাবি করছে, তাতে গোটা এশিয়া তো বটেই গোটা বিশ্বেই এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, চীন কি বিশ্বের এক নম্বর মোড়লের ভূমিকা নিতে চায়?

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যারা স্বাধীনতা চেয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন, তাঁদের কাছে চীনের এইরূপ নতুন নয়। পাকিস্তান আমলে চীন গণতন্ত্র হত্যায় পাকিস্তানি সেনানায়কদের সহায়তা করেছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাই স্বাভাবিকভাবেই চীন ছিল বিরুদ্ধে। অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে মুক্তিসংগ্রামীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মদত দিয়েছে, ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালি হত্যা, চার লক্ষেরও বেশি নারী নির্যাতন ও ধর্ষণে চীন সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে। এক কোটিরও বেশি শরণার্থীকে ভারতভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে পাকিস্তানি সেনারা। চীন বলছে, পাকিস্তানি সেনারা কোনো অত্যাচার করেনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঠেকাতে চীন ভারত সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করেছিল, হুমকি দিয়েছিল ভারত আক্রমণের। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকাতে পারেনি চীন। ভারতের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। প্রায় ৯০ হাজার সেনা নিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে রেসকোর্স ময়দানে, যেখানে একাত্তরের ৭ মার্চ এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এই পরাজয়টা শুধু পাকিস্তানের ছিল না, ছিল চীনেরও। চীন ভুলতে পারেনি এই পরাজয়ের কথা। পুরো যুক্তিযুদ্ধের নয় মাস চীনপন্থী কমিউনিস্টরা কিংবা মাওবাদীরা বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে। চীনের তত্ত্ব ছিল, ভারত আওয়ামি লিগকে নিয়ে পাকিস্তান ভাঙছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পিপলস ডেইলি লিখেছিল, 'ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তান দখল করেছে। 'সম্প্রসারণবাদী' ভারত সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকবে।' চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা মাওবাদী বলে কথিত উগ্রবাদীরা তাদের দলের নাম পরিবর্তন করেনি। পূর্ব-পাকিস্তানই বহাল রেখেছিল বঙ্গবন্ধু নিহত না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য চীনের, দুর্ভাগ্য চীনপন্থী তথাকথিত বিপ্লবীদের, ভারতীয় সেনারা তিন মাসও বাংলাদেশে অবস্থান করেনি। বিশ্বে এই ধরনের কোনো নজির নেই। চীন রচিত 'ভারতের পূর্ব পাকিস্তান দখল' তত্ত্ব খারিজ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসঙ্ঘে সদস্যপদও ঠেকিয়ে রেখেছিল। চীনের স্বীকৃতি আসে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর। অভিযোগ

আছে, ইতিহাসের এই ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ডে চীনেরও মদত ছিল। এই ধারণা জোরদার হয় এ কারণে যে, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর হত্যাকারীরা সরকার গঠন করার কয়েকদিনের মধ্যেই চীন স্বীকৃতি দেয় এবং হত্যাকারীদের সরকারের প্রতি সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। জানা যায়, চীনের ইঙ্গিতেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সরকার আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পরপরই পাকিস্তানের সঙ্গে ইসলামিক কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু ভারত একথা জানতে পেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তৎকালীন হাইকমিশনার বঙ্গভবনে গিয়ে ভারত সরকারের মনোভাব জানিয়ে দেন। ফলে মোশতাক সরকার বা পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের সরকার আর সে পথে পা বাড়ায়নি।

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী সরকারগুলো ভারতকে ঠেকাতে ইসলামকে হাতিয়ার করে পাকিস্তানের হাত ধরে— চীন কার্যত এটাই চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর এসব সরকারের আমলে বাংলাদেশ চীনের চোখে 'স্বাধীন দেশে' পরিণত হয়। সমরাস্ত্র থেকে শিল্প-বাণিজ্য সব মুঠোয় পুরে নেওয়ার 'যুদ্ধে' নামে এবং সফল হয়। বড়ো বড়ো প্রকল্প হাতে আসে। প্রকল্প ও বিনিয়োগের আশ্বাসের ফাঁদের এই ধারবাহিকতা থেকে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারও বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফাঁদ বলছি এজন্যে যে, চীন সরকার তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ বাগানোর জন্যে রাজনৈতিক চাপের পাশাপাশি বড়ো বড়ো অঙ্কের ঘুষ প্রদান 'জায়েজ' করেছে। বিশ্বের সবখানে চীন এই কৌশলে কাজ করে। নির্ধারিত কাজ পাওয়ার পর সরকারের 'বড়ো কর্তাদের' সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রকল্পের বরাদ্দ ধাপে ধাপে বাড়াতে শুরু করে, নইলে কাজের গতি থামিয়ে দেয়। এবং বাড়তি বরাদ্দ মঞ্জুর হওয়ার পর ভাগাভাগি হয়ে যায়। বিশ্বখ্যাত চীনা প্রতিষ্ঠানের ঘুষ দেওয়া ধরা পড়ে যাওয়ায় কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দেখা গেছে, কালো তালিকা থেকে প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করার জন্য চীনের রাষ্ট্রদূত দৌড়ঝাঁপ পর্যন্ত করেছেন। এসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তবে স্বস্তির কথা এই যে, বাংলাদেশে অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা এ ব্যাপারে এখন মুখ খুলতে শুরু করেছেন। লেখালেখি শুরু হয়েছে। তারা চীনের ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে সাবধান করছেন, চীনা কৌশল সম্পর্কে তথ্যগুলো তুলে ধরেছেন। আগের তুলনায় সচেতনতা তৈরির চেষ্টা চলছে।

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌদুরী মানিক সম্প্রতি এক নিবন্ধে বলেছেন, 'আজ চীন বিশ্বময় একটি আগ্রাসী জাতি হিসেবে পরিচিত। সমুদ্র সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ লঙ্ঘন করে সে দক্ষিণ চীন সাগর এবং সেখানকার কয়েকটি দ্বীপ দখলের চেষ্টায় লিপ্ত যার জন্য ওই অঞ্চলের ২০টি দেশের সঙ্গে তার যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এবং এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম, মালেয়েশিয়া, ব্রুনাই, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি (কয়েকদিন আগে ভারতও দক্ষিণ চীন সাগরে রণতরী পাঠিয়েছে)। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সাগর ও সাগর তলের সম্পদ সব দেশের সম্পদ হওয়ায় বিশ্বের সব দেশ চীনের এই আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। চীন তাইওয়ান, কমিউনিস্ট দেশ ভিয়েতনাম ও ভুটানের অংশ বিশেষ দখলেরও পাঁয়তারা করছে বিধায় এই দেশগুলো শঙ্কিত। অতীতে বেআইনিভাবে তিব্বত দখল করেছে। ১৯১৪ সালে সিমলা চুক্তির সৃষ্টি ম্যাকমোহন লাইন লঙ্ঘন করে সম্প্রতি কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করেছে।'

চৌধুরী আরও বলেছেন, 'গ্রাম্য মহাজনদের মতো চীন গরিব দেশগুলোকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এমনকী ঋণগ্রস্ত দেশের ভূমি পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা বন্দর ৯৯ বছর লিজে দখল নেওয়া তারই উদাহরণ। এভাবে আফ্রিকান দেশ জিবুতিতে গড়ে তুলেছে সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন হাম্বান টোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দেওয়া ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত'। ■

With Best Compliments

from -

A Well Wisher

অতিথি কলম

নন্দন নিলেকানি

করোনার সংক্রমণ থেকে ভারতকে কীভাবে বাঁচানো যাবে

দেশ আজ একটি আপৎকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি। দেশকে টিকাকরণের মাধ্যমে নিরাপদ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সময়ের দাবি। এটি কোনো নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ নয়, সমগ্র সরকারি বিভাগকে একযোগে হাত লাগিয়ে এটিকে 'মিশন মোড-এ প্রয়োগ করতে হবে।

আজকের যা পরিস্থিতি তাতে সমস্ত রকম পদ্ধতির সাবধানতা অবলম্বনের পরও দেশে করোনার বৃদ্ধি জারি আছে। সকলের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি প্রতিষেধক টিকার ওপর। কখন সেটি হাতে পাওয়া যাবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে, হাতে পেলেই কি এত বড়ো জনসংখ্যার দেশে রাতারাতি টিকাকরণ সম্ভব? ১৩০ কোটিকে টিকা দিতে আমাদের সিস্টেম কতটা প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে সরকারকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কোন কোন টিকাগুলি অনুমোদিত হয়েছে তার পঞ্জীকরণ করতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও যে কোনো সময় কোনোটি বাদ যেতে পারে এবং আরও উন্নত কোনো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। টিকা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী অব্যাহত।

দ্বিতীয়ত, সরকার প্রত্যেক রকমের টিকার নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেবে। এরপর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে কোন কোন সংস্থা টিকা দেওয়ার অধিকার পাবে তার তালিকা তৈরি করবে। এগুলি সরকারি হাসপাতাল, নামকরা বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়গনস্টিক সেন্টার যার মান প্রতিষ্ঠিত এমনকী সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসা ওষুধের দোকানগুলিও হতে পারে। কয়েক লক্ষ মানুষকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে টিকা কীভাবে মানব শরীরে দেওয়া হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার বিষয়টিও আছে। নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট করে কোথায় কোন প্রতিষ্ঠানে টিকাকরণ হচ্ছে তা প্রচারপত্র মাধ্যমে জানাতে হবে। এই স্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত, চটজলদি তৈরি করে নেওয়া বা বিভিন্ন এলাকায় চলমান স্টেশনও হতে পারে। অর্থাৎ টিকা যেন দেশের সর্বত্র উপলব্ধ হয়। সরকার এই মর্মে নির্দিষ্ট টিকাকরণ সংক্রান্ত সফ্টওয়ার তৈরি করবে যা স্মার্টফোন ও ল্যাপটপে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা যায়। এগুলি নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে বিতরণ করা হবে যাতে একেবারে প্রতিটি টিকাকরণ সঠিকভাবে সেই মুহূর্তে নথিবদ্ধ ও ক্যামেরাবন্দি হয়। এরপরই তা দ্রুত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে পাঠানো হবে অবশ্যই গোপনীয়তা নিরাপত্তা ও তথ্যভুক্তির সঙ্গে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ১ বছরের মধ্যে দেশে ১ লক্ষ টিকাকরণ কেন্দ্র তৈরি করে নেওয়া যাবে। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে টিকার উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে চলবে।

এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সরবরাহ শৃঙ্খল যার মধ্যে টিকা যথাযথ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড চেইন তৈরির পরিকাঠামোও আবশ্যিক। টিকার বিক্রি নিয়ন্ত্রিত হবে অনুমোদিত বিক্রেতা ও অনুমোদিত প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সরাসরি। প্রদানকারীদের অবশ্যই কোল্ড চেইন-এর পরিকাঠামো থাকতেই হবে। টিকাকরণকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে একটা বড়ো জোয়ার আসতে পারে। নতুন মোবিল কোল্ড চেইন তৈরি হলে অজস্র বাতানুকূল ট্রাকের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে যে কোল্ড চেইনগুলি ততটা ব্যবহৃত হয় না সেগুলিকে সফল করে ব্যবসার নতুন গতিমুখ খুলে দেওয়া যাবে। পরিকাঠামো এমন হবে যে, দেশের মানুষ যেন যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অঞ্চলে উপযুক্ত টিকাকরণ কেন্দ্র পেয়ে যেতে পারে। তারা আবার সুবিধে মতো সময়ে টিকা নেওয়ার জন্য অনলাইনে বুকিংও করে নিতে পারে। তবে কোনো টিকাকরণ কেন্দ্রে গেলে প্রথমেই নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আধার বা ফোন নাম্বারের মতো কোনো পরিচয়পত্র দিতে হবে সেগুলি কেবল ডিজিটালি পরীক্ষা করা যায়। একজন অনুমোদিত প্রশিক্ষিতই টিকা দেওয়ার অধিকারী। এই তথ্য টিকাকরণের সঙ্গে সঙ্গেই আপলোড হবে। এর মধ্যে টিকা প্রদানকারী ও গ্রহীতার নাম ও পরিচয়পত্রের অনুলিপি থাকবে। থাকবে টিকাটির নিজস্ব ব্যাচ নম্বর থেকে অন্য বিশদ তথ্য। গ্রহীতাকে যে অর্থ এ বাবদ দিতে হবে তা সঙ্গে সঙ্গেই টিকা প্রদানকারী সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে। সেই মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার থেকে এই মর্মে গ্রহীতার নামে একটি সার্টিফিকেট তৈরি হয়ে যাবে। এই প্রমাণপত্র স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে, প্রয়োজনে প্রিন্ট আউট নেওয়া চলবে বা ডিজিটাল লকারেও রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই গোটা প্রক্রিয়াটা কিন্তু ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে। প্রত্যেকটি টিকাকরণ কেন্দ্রে দিনে ৫০টি টিকাকরণ করতে পারলে (যা মোটেই অসম্ভব নয়) ভারত প্রতিদিন ৫০ লক্ষ নাগরিকের টিকাকরণ সফলভাবে করতে সক্ষম হবে।

এই ডিজিটাল সার্টিফিকেট কিন্তু বিশ্বব্যাপী মান্য হবে এবং যে কোনো সময় মূল ডাটা বেসের সঙ্গে চেক করে নেওয়া যাবে। কোনো ব্যক্তির কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কিনা তা অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এ বিষয়ে ইয়োলো ফেভারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ামক সংস্থা প্রমাণপত্র চেয়েছিল। এটিই হবে সেই প্রমাণপত্র। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রমাণপত্র নিয়ে বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ

করতে পারবেন। আবার যদি দেখা যায় টিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়সাপেক্ষ সেক্ষেত্রে প্রমাণপত্রের ওপর এক্সপায়ারি ডেট লেখা থাকবে। ওই ব্যক্তিকে পুনর্টিকাকরণ করতে হবে। টিকা যদি ২ ডোজের হয় সেক্ষেত্রে প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দিয়ে পরবর্তী তারিখ উল্লেখ করে দেওয়া হবে। যে সমস্ত নাগরিকের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাঁরা নিজ খরচে টিকাকরণ করবে। সরকারের তরফে নিখরচায় সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী, অন্যকর্মী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে গরিব ও 'কোভিডে' সংক্রমিত হওয়ার বেশি সম্ভাবনাময় লোকজনকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকাকরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানিগুলি তাদের কর্মী ও পরিবারের টিকার খরচের দায়িত্ব নেবে। বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও করপোরেট ফাউন্ডেশন ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। গরিব নাগরিকের তরফে তারা প্রয়োজনীয় অর্থ জমা করে তাদের টিকাকরণের পথ সুগম করতে পারে।

একটি টিকার কার্যকারিতার সময়কাল সবসময়ই পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখার দরকার হয়। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের টিকাকরণ কেন্দ্রে জানিয়ে দিলে সমগ্র দেশের পক্ষে ডিজিটাল রেকর্ডে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে ব্যবস্থাটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সহজ হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি দেখা যায় টিকাকরণ সত্ত্বেও কোনো অঞ্চলে 'কোভিডের' প্রকোপ বাড়তে শুরু করল তাহলে বুঝতে হবে টিকার কার্যকারিতা প্রত্যাশামাফিক হয়নি। অন্যদিকে কিছু কিছু উপসর্গের অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি ঘটলে বুঝতে হবে সেটা টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথম দিকে যখন বাজারে পর্যাপ্ত টিকার জোগান থাকবে না তখন এই ভাবেই প্রক্রিয়াটিকে লাগু করতে হবে। আগে বলা নির্দিষ্ট জরুরি পরিষেবার কর্মীদের ওপর এর পরবর্তী ধাপে থাকবে নতুন টিকা সম্পর্কে আতঙ্ক, এক শ্রেণীর মানুষের টিকাকরণে অনীহা। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ টিকাকরণে এগিয়ে যেতেই হবে। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই টিকাকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ন্যাশনাল ডিজিটাল হেল্থ মিশনের কাজকেও এক লাফে অনেক এগিয়ে নেওয়া যাবে। প্রত্যেক নাগরিক ভোটার কার্ডের মতো একটি স্বাস্থ্য পরিচয়পত্রে তার টিকার বিবরণও থাকবে। কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ বিভাগ ও শিক্ষা দপ্তরের 'দীক্ষা প্লাটফর্মের' মাধ্যমে টিকা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষিত করতে ট্রেনিং মোডিউল দেওয়া যেতে পারে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ইতিমধ্যেই যে ডিজিটাল হেল্থ মিশনের পরিকাঠামো তৈরি করেছে তার মাধ্যমে কারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অংশীদার তা নিশ্চিত তো হয়েই আছে। তাদের টাকা দেওয়ার প্রশ্ন নেই।

সরকারের ই-মার্কেট প্লেস (জিইএম) প্রকল্পে কোন কোন টিকা অনুমোদিত হলো তার নাম ও দাম উল্লেখ করা থাকবে, অনুমোদিত টিকা প্রদানকারী সংস্থা সরাসরি সেখানেই বরাত দিতে পারবে। অর্থমন্ত্রকের বহু প্রকল্পে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের (ডিডিটি) ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর সঙ্গে নতুন টিকার অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রটি যোগ করতে কোনো অসুবিধে নেই। বহু কৃতবিদ্য আমলা যাঁরা আধার কার্ড প্রস্তুতির সময় অসাধারণ কাজ করেছিলেন তাঁরা আজ প্রবীণ হয়েছেন বা সদ্য অবসর নিয়েছেন। তাঁরা ডাকলে সানন্দে তাঁদের অভিজ্ঞতা এই প্রকল্পেও নিয়োজিত করতে দ্বিধা করবেন না। শুধু তাই নয়, বহু উন্নত মেধার প্রযুক্তিবিদ রয়েছেন যাঁরা নিজেদের মেধা দিতে উদগ্রীব, যেহেতু দেশ আজ একটি আপৎকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি। দেশকে টিকাকরণের মাধ্যমে নিরাপদ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সময়ের দাবি। এটি কোনো নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ নয়, সমগ্র সরকারি বিভাগকে একযোগে হাত লাগিয়ে এটিকে 'মিশন মোড-এ প্রয়োগ করতে হবে। আমরা এ কাজে সফল হলে সারা বিশ্বের কাছে একটি উদাহরণ সৃষ্টি হবে যে, কীভাবে মহামারীর সফল মোকাবিলা করতে হয়। এই সম্মিলিত উদ্যোগ ও সফলতা 'আত্মনির্ভরতা'-র পথে হবে সেরা পদক্ষেপ।

(লেখক ইনফোসিসের চেয়ারম্যান ও যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা এবং ইউনিক আইডেন্টিফিকেশনের অথরিটি অব ইন্ডিয়ার পূর্বতন চেয়ারম্যান)

শোক সংবাদ

শতবর্ষে পা দিয়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ আগস্ট পরলোকের পথে পা বাড়ালেন হাওড়া মহানগরের অরবিন্দ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক রমেন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার। 'কার্তিকদা' নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। হাওড়ায় সঙ্ঘকাজের প্রায় সূচনাকালের স্বয়ংসেবক। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন শাখায় আসতেন, সঙ্গে আনতেন নিজের বাগান থেকে ফুল, ধ্বজস্থানে দেওয়া জন্য। আমৃত্যু স্বস্তিকার গ্রাহক ছিলেন। ছোটোদের জন্য বইও লিখেছেন।

* * *

হাওড়া মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি হাওড়ার কেশব স্মৃতি ভবনে 'কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা সমিতি' পরিচালিত হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিগত কুড়ি বছর ধরে দায়িত্ব সামলেছেন। স্মৃতিরক্ষা সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও এক কন্যা রেখে গেছেন। কয়েক বছর আগে পথ দুর্ঘটনায় তাঁর বড়ো মেয়ে ও নাতনির প্রাণহানি ঘটে।

* * *

কলকাতা মহানগরের বাঘা যতীন ভাগের সহ ভাগ কার্যবাহ বিপুল হালদারের মা গত ২ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিশেষ নিবন্ধ

ভারত তথা হিন্দুবিরোধী এক সন্ত্রাসী শক্তির নাম কমিউনিজম

রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জি

দীর্ঘ সময়ে রাজনৈতিক অপশাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গর মানুষের মনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মিথ্যা মোহ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছিল। পৃথিবীর বুকে সব থেকে বেশি গণহত্যাকারী শাসকদেরকে সাম্যবাদের জনক হিসেবে মানুষের সামনে সুপরিকল্পিত মিথ্যাচারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ফায়দা তুলে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে এই একনায়কতান্ত্রিক শাসকদের রাজনৈতিক ভাবে প্রায় শেষ করে দিয়েছে কিন্তু এরপরেও তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা তো দূরের কথা, উলটে সেই একইভাবে তারা আজও মানুষের সামনে সমানভাবে মিথ্যা কথা বলে চলেছে। কোনো তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়, শুধুমাত্র মিথ্যাকথা এবং ব্যক্তি আক্রমণের উপর ভিত্তি করে বারংবার তারা আমাদের সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানছে। শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম নয়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়েও তারা ক্রমাগত ভুল তথ্য পরিবেশন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। লক্ষ্য তাদের একটা, বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্বকে শেষ করে দেওয়া। তাই ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে কিছু সত্যি কথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈদিক সভ্যতা ও সাম্যবাদ : বৈদিক সভ্যতার মূল মন্ত্রই ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথাও ঋক্‌বেদে বর্ণনা করা হয়েছে (RV:X.191.2)। জন্মের ভিত্তিতে জাতিভেদ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য ভেদের বিরুদ্ধেই ঋক্‌বেদে লেখা রয়েছে (RV:X.191.3)। এই তথ্য ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর বইতে উল্লেখ করে গেছেন (Indian Philosophy)। তাহলে এই জাতিভেদ প্রথা আমাদের হিন্দু সমাজে এলো কীভাবে? হিন্দুধর্মই যে এই জাতিভেদ প্রথার জন্ম দিয়েছে সে নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর সামাজিক এই বৈষম্য মুছে ফেলার জন্য কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল না বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মতে বহিরাগত শাসকরা ভারতবর্ষে আসার পরেই আমাজের সমাজে এই ভেদাভেদ শুরু হয় (The Discovery of India)।

আধুনিক গবেষকদের মত অনুযায়ী, T.H. Griffith এবং H.H. Wilson এই দুইজন বিখ্যাত অনুবাদক ঋকবেদের অনুবাদ করার সময় মূল সংস্কৃত শ্লোক ভুল ভাবে অনুবাদ করেন। সেই থেকেই একদল সুবিধাবাদী মানুষ সমাজে এই ভেদাভেদ প্রকটভাবে অপপ্রয়োগ করতে শুরু করেন। এই বৈষম্য যখন সমাজের চরম পর্যায়ে

পৌঁছে ছিল তখন তা থেকে মুক্তির জন্য ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। যাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা এই সমস্ত তথ্য সুপরিকল্পিত ভাবে বিকৃত করে। শ্রীচৈতন্যের ৩৩৩ বছর পরে জন্ম নেওয়া কার্লমার্কসকে তারা সাম্যবাদের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

হিন্দু সহনশীলতা এবং বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ : ভারতবর্ষ এবং হিন্দু হলো একই হৃদপিণ্ডের দুইটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মতো অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন অনুযায়ী পাশ্চাত্যের ধর্মপুস্তক শ্বাসগ্রহণের মতো অর্থাৎ বাইরে থেকে ভিতরে আসছে কিন্তু আমাদের ধর্মপুস্তকগুলি আগের মতো অর্থাৎ ভেতর থেকে বাইরে আসছে। মুসলমান আক্রমণ তরঙ্গ ভারতবর্ষে আসবার আগে ধর্মের জন্য রক্তক্ষয় কী তা এদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। ইসলাম এদেশে আসার পর কয়েকশো বছর ধরে ‘আল্লা-হো-আকবর’ ধ্বনিতে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এমন একজন হিন্দু ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের বিনাশ আশঙ্কা না করে থাকতে পেরেছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন (হিন্দুধর্ম, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়)। কিন্তু এইসব অত্যাচার সহ্য করার পরেও আমাদের বিনাশ ঘটেনি। তার কারণ হিসেবে স্বামীজী বলেছেন, “জাতির বিশ্বাসের জীবন কোনো নির্দিষ্ট ভাবের মধ্যে থাকে, সেখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব, যতদিন না তাতে আঘাত লাগে ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই ধর্ম আমাদের জাতির জীবনীশক্তি, আর যতদিন আধ্যাত্মিকতা অব্যাহত থাকবে ততদিন জগতের কোনো শক্তি এই জাতিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না।”

স্বামীজীর বক্তব্যের তাৎপর্য আজকের দিনেও একই রকম প্রাসঙ্গিক। দেশ বিভাজনের সময় ভারতবর্ষ ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি হওয়া পাকিস্তান এই দুই দেশই তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের সমান

পশ্চিমবঙ্গের নির্লজ্জ কমিউনিস্ট নেতারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রটানোর আগে নিজেরা জবাব দিক, কেন তাদের অধিকাংশ নেতাকে পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয়েছিল ?

অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র রক্ষা করেছে ভারত। তাই বর্তমান পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই এবং বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যা ক্রমাগতভাবে কমতে কমতে ৩০ থেকে ৮ শতাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কীভাবে একের পর এক দেশ মুসলমান অধ্যুষিত দেশে পরিণত হয়েছে অল্প সময়ের ব্যবধানে।

কিন্তু কমিউনিস্টরা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের পছন্দমতো লোকদের শিক্ষা, অর্থ ও বিনোদনের জগতে শীর্ষস্থানে বসিয়ে, ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে, স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের সমালোচক হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থাপনা করে, আমাদের জীবনীশক্তির উপর আঘাত হেনে ভারতকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মনীষীদের সম্পর্কে মিথ্যাচার : রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বামীজী বা নেতাজী থেকে শ্যামাপ্রসাদ কেউই বাদ যাননি বামেদের মিথ্যাচারের শিকার হতে। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২-৪৩-এ সুভাষচন্দ্র বসুর সৃষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লককে ঘর শত্রুর আখ্যা দিয়েছিল এবং তাদের মুখপত্র পিপলস ওয়ারে নেতাজীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ কার্টুন প্রকাশ করেছিল। অবশ্য এসব তথ্য বর্তমান প্রজন্মের ফেসবুকীয় কমরেডদের জানার আগ্রহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের বুকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির উত্থান যত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে ঠিক একই গতিতে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি আক্রমণ ও মিথ্যাচার বাড়িয়ে চলেছে কমিউনিস্টরা। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগকে যুক্তি এবং উপযুক্ত প্রমাণ-সহ খণ্ডন করেছেন পিনাকী পাল ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ‘রবীন্দ্রনাথ-নেতাজী- স্বামীজীর পর মিথ্য বাম কুৎসার লক্ষ্য শ্যামাপ্রসাদ’— এই লেখনীর মাধ্যমে। তাই সেই বিষয়ে আলোচনা না করে শুধু মাত্র কয়েকটি তথ্য তুলে ধরতে চাই। এক, বীর সাভারকারের ব্রিটিশ সরকারকে মুচলেকা দেওয়ার কথা বারবার মানুষের সামনে তুলে এনে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন বামপন্থীরা, কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বপ্রথম জেনারেল সেক্রেটারি পি সি যোশী ব্রিটিশ সরকারকে যে মুচলেকা দিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে আমাদের অনেকেরই জানা নেই। দুই, দেশনায়ক নেতাজীর দেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে হাত মেলানোর রণনীতিকে সমালোচনা করতে কমিউনিস্টরা পিছপা হন না। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট কমিউনিস্টদের পিতৃতুল্য গণহত্যাকারী স্ট্যালিন যখন হিটলারের সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষরিত করে সেই নিয়ে কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টরা কোনো শব্দ ব্যয় করেননি। তিন, ১৯০০ সালের পর থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন বলিদান দিয়েছিলেন তাঁদেরকে বর্তমান কমিউনিস্টরা অতি নির্লজ্জের মতো ‘কমরেড’ বলে সম্বোধন করেন। উদাহরণস্বরূপ ভগৎ সিংহ যিনি জীবনে কোনোদিনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেননি। কিন্তু তারপরও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে চলেছে

কমিউনিস্টরা। চার, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লিগের কোনো নেতাকে গেপ্তার করা হয়নি। এরপরেও নির্লজ্জ কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের দেশপ্রেম কতটা ছিল তা দেখানোর চেষ্টা করে চলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কমিউনিস্টদের এহেন আচরণের কারণ কী? কারণটা হলো, যে সভ্যতা গোটা বিশ্বকে নগর পরিকল্পনা শিখিয়েছিল। যে সভ্যতা গোটা বিশ্বকে শূন্যের ব্যবহার শিখিয়েছিল। যে সভ্যতা অজন্তার গুহাচিত্র এবং ইলোরার কৈলাস মন্দির ইত্যাদি গোটা বিশ্বকে উপহার দিয়েছিল সেই বৈদিক সভ্যতাকে কমিউনিজমের জন্মদাতা কার্লমার্কস অর্ধসভ্য ও অর্ধবর্বর বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসে নাকি আমাদেরকে সভ্য করেছিল এবং আমাদের দেশে বিপ্লব এনেছিলেন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই নেতাজী তাঁর নিজের লেখা 'The Indian Struggle' বইতে লিখে গেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভারতবর্ষের মানুষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য। যেহেতু ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তাদের মতাদর্শ কখনোই ভারতবর্ষে স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু তারপরেও আপাদমস্তক বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী এবং গোটা বিশ্বের বুকে প্রায় ১২ কোটি গণহত্যাকারী (Death by Government by R. J. Rummel) লেনিন-স্ট্যালিন-মাও- পলপটদের উত্তরাধিকারী কমিউনিস্টরা এখনো ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার স্বপ্ন দেখছে। নিজের সঙ্গে মতবিরোধ হলে কীভাবে মানুষ খুন করতেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখা চে গুয়েভারা (History Collection)-কে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা হিসেবে তুলে ধরেছে ভারতের কমিউনিস্টরা।

আজকে পশ্চিমবঙ্গের নির্লজ্জ কমিউনিস্ট নেতারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রটানোর আগে নিজেরা জবাব দিক কেন তাদের অধিকাংশ নেতাকে পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয়েছিল? স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক-এর বিশিষ্ট অধ্যাপক ডক্টর সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার তাঁর লেখা 'Mukti : Free to be born Agsin : Partitions of Indian Subcontinent, Islamism, Hinduism, Leftism and Liberation of the Faithful' বইতে সঠিকভাবেই বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, কিন্তু তাদের সঙ্গে বাস নাই'।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুর এই সংকটকালে, এই সর্বগ্রাসী, ধ্বংসাত্মক ও গণহত্যাকারী বিকৃত মানসিকতার কবল থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। ঠিক যেমনটি স্বামীজী বলেছিলেন— 'Again the force to raise them must come from inside. i.e. from the orthodox Hindus'। তাই আমাদের মানবতার আদর্শ হোক শ্রীচৈতন্য বা স্বামীজী। আমাদের বিপ্লবের আদর্শ হোক ক্ষুদিরাম বা ভগৎ সিংহ বা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং আমাদের প্রতিরোধের আদর্শ হোক ঋষি অরবিন্দ বা শ্যামাপ্রসাদ। স্বামীজীর বাণী আমাদের পাথেয় হওয়া উচিত — 'তোমাদের ভিতর যাহা আছে নিজের শক্তি বলে তাহা প্রকাশ করো কিন্তু অনুকরণ করিও না অথচ অপরের যা ভালো তা গ্রহণ করো। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে, অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া তার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না'।

(লেখক গবেষক, অ্যালবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)

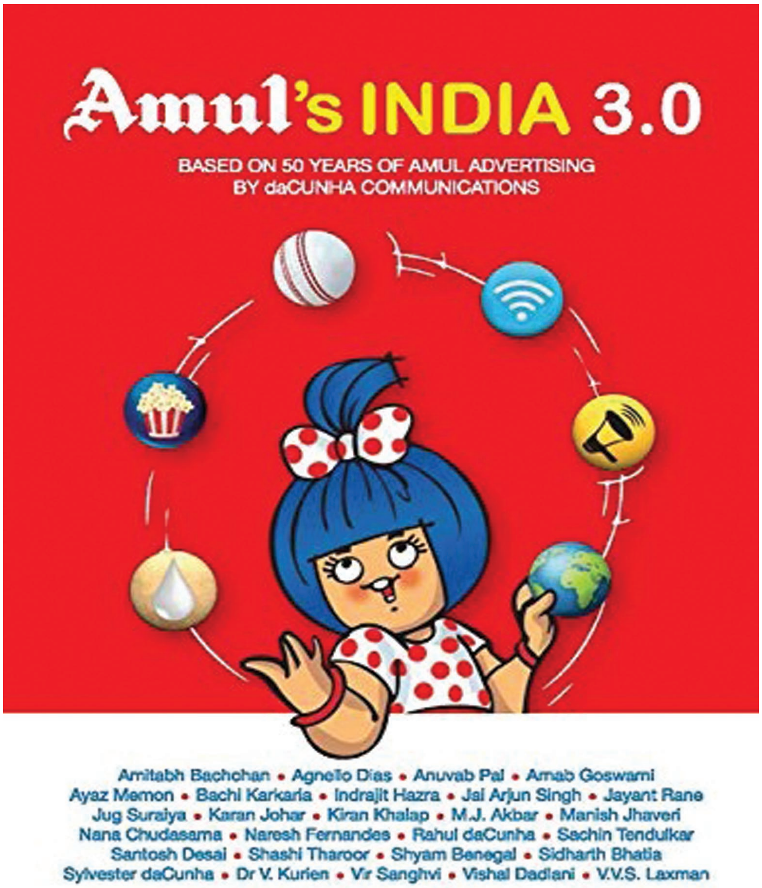

ভারতে মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর

চন্দন রায়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন একেবারে আসল কথাটি। তারপর অবশ্য তিনি ঢোক গিলেছিলেন। সাধারণ চোখে মক্তব ও মাদ্রাসা একটি ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলিই সন্ত্রাসের আঁতুরঘর। এর গভীরে রয়েছে একটি জিহাদি আগ্নেয়গিরি, তাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী এক একটি জেহাদি স্ফুলিঙ্গ। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও নির্লিপ্ততা এমনকী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে অন্ধ ও উদাসীনতায় ব্যাঙের ছাতার মতো এই ভয়ংকর প্রতিষ্ঠান গ্রামে-গ্রামে মহল্লায়-মহল্লায় গড়ে উঠেছে। যার পরিণতিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো দেশগুলি প্রতিনিয়ত জেহাদি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

আমাদের ভারতও এই ধ্বংসাত্মক জেহাদি কার্যকলাপ থেকে মুক্ত নয়। বার বার এই জেহাদি আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ হয়েছে ভারতবর্ষে। ফলস্বরূপ ভারত ভাগ হয়েছে এবং ভারতের দুইদিকে দুই জেহাদি দেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও প্রতিনিয়ত ভারতভূমিতে জেহাদি আঘাত হানছে। কখনও সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চালিয়ে, কখনও-বা ইসলামি আন্দোলনের নামে ভারতভূমিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভারতভূমিকে পুনরায় খণ্ড বিখণ্ড করতে তৎপর। এদের লক্ষ্য পুনরায় ভারতভূমিতে ইসলামি শারিয়া শাসন কায়েম করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি দেশে পরিণত করা এবং ভারত দেবভূমিতে আরবি ও ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর হযরত মহম্মদ জিহাদের মাধ্যমে আরবভূমিতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বিরোধী মতালম্বীদের ছলে-বলে-কৌশলে ইসলাম অনুসারী করে তাদের বিষয় সম্পত্তি দখল করা এবং নিজ আনুগত্যে আনা। আনুগত্যে অপরাগ পুরুষদের হত্যা করে তাদের নারী শিশু ও বিষয়-সম্পত্তি গনিমত হিসেবে নিজেদের মাধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া (কেউ এই বিষয়ে প্রশ্ন তুললে দয়া করে কোরান হাদিস গ্রন্থ পড়ে দেখে নিতে পারেন)। হযরত মহম্মদ তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত মত বিস্তার ও অনুসারী বৃদ্ধির জন্য দিহাদকেই ছিল সেরা পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ইসলামি শাসন পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম রক্ষার জন্য বিশ্বস্ত ইসলামি বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই লক্ষ্যে হযরত মহম্মদ আরবের মদিনাতে প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর অনুসারী নব মুসলমানদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে জেহাদি সেনা তৈরি করা শুরু করেন।

ভারতবর্ষে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন ও বিস্তার :

ভারতবর্ষে আরবীয় সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রাসারণবাদী খলিফাদের আগ্রাসন, ভারত বর্ষদখল ও ইসলামি সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের সূচনা শুরু হয়। এটা সমস্ত মুসলমান শাসকদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতো। মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুদেশ দখলের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ইসলামি আগ্রাসন ও দখলদারি শুরু করে। পরবর্তীতে সুলতান মাহামুদ ঘোরি। তৈমুর লং, মহম্মদ বিন তুগলক, সর্বশেষে বাবর ভারতবর্ষ দখল করে। সমস্ত আক্রমণকারীরা প্রথমেই ভারতের প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও দখল করে তার উপর মসজিদ নির্মাণ ও সংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করে।। মন্দিরের বিষয় সম্পত্তি লুট ও দখল করে মসজিদ ও মাদ্রাসার অধিকার ভুক্ত করে। তার জলন্ত প্রমাণ সোমনাথ মন্দির, রামজন্মভূমি মন্দির, কৃষ্ণজন্মভূমি

মন্দির, কাশীবিশ্বনাথ মন্দির সহ শত শত মন্দির। এমনকী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বাদ যাযনি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির লাখেরাজ নামে এক কালাকানুন করে কোনো অমুসলমান বা হিন্দু ব্যবসায়ী বা ভূস্বামীর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে ওই তার মৃত্যুর পর তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি মাদ্রাসাকে হস্তান্তর করাম নিয়ম চালু করেন। ঠিক যেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু সম্পত্তি দখল করার জন্য শত্রসম্পত্তি কালাকানুনের মতো। মহম্মদ বিন কাসিম প্রথম ভারতবর্ষে ইসলামি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করে। মহম্মদ ঘোরি ১২০০ খ্রিস্টাব্দে আজমিরে মাদ্রাসা স্থাপন করে সরকারিভাবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সুলতান ও শাসকরা সরকারি স্তরে ব্যাপকভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মাদ্রাসা স্থাপন করে। মহম্মদ বিন তুগলক মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে শুধু দিল্লিতে এক হাজার মাদ্রাসা স্থাপন করে, সুবে বাঙ্গলায় ৮০ হাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করা হয় । কুখ্যাত লাখেরাজ আইনে হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি দখল করে বাঙ্গলার প্রায় একচতুর্থাংশ জমি মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। অনুমান করা যায়, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে ইসলামি শাসকদের সরাসরি সরকারি সহযোগিতা ও অনুদান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যে নিয়েই তারা ভারতভূমিতে মাদ্রাসা স্থাপন করে।

ইসলামি শাসনকালে ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ঃ

● মুসলমান শাসনের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে এবং জিজিয়া কর প্রভৃতি আইনে অর্থনৈতিক নিপীড়নে ফলে যারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হতো তাদের মধ্যে কোরান হাদিসের শিক্ষা, ইসলামি অনুশাসন, নিয়মনীতি পালন ও আরবি ভাষা শিক্ষায় পারদর্শী করা এবং আরবী ভাষ ও আদব কায়দা ভারতীয় সমাজে বিস্তৃত করে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করা।

● নবসৃষ্ট মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও মুসলমান শাসকদের প্রতি আনুগত্যে আনা।

● ইসলামি শরিয়া আইন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য দক্ষ আলেম, মওলনা ,মৌলভি ও ইমাম সমাজ সৃষ্টি করা এবং সরকারি কার্যে বিশ্বস্ত সহযোগী শক্তি তৈরি করা।

● মুসলমান শাসকদের প্রতি আনুগত্যশীল ইসলামি জেহাদি সেনা গড়ে তোলা যারা স্থানীয়ভাবে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সহযোগী শক্তি হিসেবে অংশগ্রহণ করা।

● ইসলামি আইন ব্যবস্থার জন্য কাজি (বিচারক) নিয়োগ করা।

● ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও মাদ্রাসায় ইমাম ও শিক্ষক নিয়োগ করা।

● সর্বোপরি, মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে কোরান হাদিসের শিক্ষায় ইসলামি আলোকে অমুসলমানদের প্রতি চরম ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা নব মুসলমানদের মনে রোপণ করা।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতে মাদ্রাসা ব্যবস্থার অবস্থা :

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ইসলামি শাসনের আইন কানুন শিথিল হয়। বিশেষ করে মসজিদ মাদ্রাসার জন্য সরকারি অনুদান বন্ধ হয় এবং কুখ্যাত লাখেরাজ আইন বাতিল হয়। ফলে অর্থাভাবে মাদ্রাসা সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া আধুনিক সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

ভারতে নবরূপে পুনরায় মাদ্রাসা স্থাপন কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য :

ইসলামি শাসনের পতনের পর মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অনুদানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনরায় মাদ্রাসা স্থাপনে সক্রিয় হয়ে উঠে। ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা গড়ে উঠে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য একই থাকে।

● ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পুনরায় ভারতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত করা।

● ভারতের মুসলমানদের একত্রিত করে সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা।

● দেশে সরকারি আইনের সমান্তরালে শারিয়া আইন ব্যবস্থা মুসলমান সমাজে প্রচলিত রাখা, যা আজও স্বাধীন ভারতে বিদ্যমান।

● মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক জোটবদ্ধ শক্তি তৈরি করা।

● ধ্বংসাত্মক গণআন্দোলন গড়ে তুলে নির্বাচিত সরকারকে সংকটে ফেলে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা, যা আজও স্বাধীন ভারতে ঘটে চলেছে।

● পুনরায় ভারত বিভাজন করে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে আলাদা মুসলমান দেশের দাবি তোলা।

● দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে সমঝোতা ও বোঝাপড়া করে মুসলমান স্বার্থ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

ভারতে প্রচলিত মাদ্রাসা সমূহ :

● **কওমি মাদ্রাসা :** মহা বিদ্রোহের পর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মওলনা কাসেম নানুতবি উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে দারুল উলুম দেওবন্দ নামে কওমি মাদ্রাসা স্থাপন করে এবং ভারতবর্ষে পুনরায় ইসলানি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন ধারার ইসলামি আন্দোলন শুরু করে। বর্তমান এই মাদ্রাসার অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোনো ধরনের ইসলামি আন্দোলনে এদের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে।

● **খারিজি মাদ্রাসা :** কওমি মাদ্রাসার মতো সরকারি অনুমোদন ছাড়া মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে যাদের কাজকর্মে কওমি মাদ্রাসার মতো সাদৃশ্য রয়েছে।

● **অলিয়া মাদ্রাসা :** মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে আধুনিক সাধারণ শিক্ষা প্রসারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ১৯০৮ সালে কলকাতায় সরকার অনুমোদিত ও সহযোগিতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে। উদ্দেশ্য ছিল কওমি ও খারিজি মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষা দিয়ে শুধুমাত্র আলেম, মওলানা, মৌলভি ও ইমাম তৈরি করা এবং ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলা যা ব্রিটিশ শাসকদের মাথাব্যথার কারণ ছিল। দ্বিতীয় কারণ ছিল, ওই সময়ে সাধারণ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত যুবসমাজ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছিল, ফলে মুসলমান যুবসমাজকে হিন্দু যুবসমাজ থেকে পৃথক করা এবং নিজেদেরকে মুসলমানপ্রেমী হিসেবে উপস্থাপন করা। যা পরবর্তীতে মুসলমান সমাজে ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারত ভাগের মানসিকতা গড়ে উঠে । এতে কিন্তু কওমি ও খারিজি মাদ্রাসার কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারেনি, এখনও আলিয়া মাদ্রাসা স্বাধীন ভারতে সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়ে আসছে।

বর্তমান মাদ্রাসাগুলির ভূমিকা ও কার্যকলাপ :

● বর্তমানে উত্তর পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও 'বৃহত্তর ইসলামি বাংলাদেশ' গঠন করা।

● উত্তর পূর্ব ভারত থেকে জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত সর্বশেষ পাকিস্তান পর্যন্ত ভারতের সীমান্তরেখা বরাবর জেহাদি ইসলামি করিডোর সৃষ্টি করা। (নেপাল ভারত সীমারেখা বরাবর বিহার উত্তরপ্রদেশ উত্তরখণ্ড হিমাচলপ্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীর)

● সর্বোপরি, ভারতকে পুনরায় মুসলমান দেশে পরিণত করা ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত করে দারুণ ইসলামের সাম্রাজ্য স্থাপন করা ও প্যান ইসলামিজম্ সফল করা।

কার্যকলাপ :

● উত্তর পূর্ব ভারত অবস্থানগত ভাবে ভারতের বৃহৎ ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সরু করিডোর (চিকেন নেক বলে) দ্বারা সংযুক্ত। এই চিকেন নেকের একদিকে বাংলাদেশ এবং অন্য দিকে নেপাল এছাড়া উত্তরপূর্ব ভারতের সাত রাজ্য বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ সীমারেখা দ্বারা যুক্ত। পাহাড়ি রাজ্য হওয়ার কারণে সহজেই বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটছে যা ব্রিটিশ ভারত আমল থেকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হয়েছে।

● বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি, আগামী ২৫ বছর বাদে এই জনসংখ্যা এসে দাঁড়াবে ৩০ কোটি। আবার বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র ও বড়ো নদী উপকূল অঞ্চল সমুদ্র জলে স্থায়ীভাবে প্লাবিত বা নিমজ্জিত হবে, ফলে বাংলাদেশের ১/৩ ভূমি সমুদ্র বা নদী গ্রাসে চলে যাবে এবং বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়বে। এরফলে বাংলাদেশের এই বিপুল জনসংখ্যা কর্মসংস্থান বা নিরাপদ বসবাসের জন্য সারাপৃথিবী ব্যাপী অনুপ্রবেশ করছে। উত্তরপূর্ব ভারত সবচেয়ে সহজে অনুপ্রবেশ ও নিরাপদ স্থান, তাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় মুসলমানদের সহায়তায় উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে অবাধে অনুপ্রবেশ করছে দীর্ঘদিন ব্যাপী প্রতিনিয়ত।

● দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব সল্লিমুল্লাহর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসকদের প্রভাবিত করে বৃহত্তর বাঙ্গলাকে বিভক্ত করে অসম-সহ পূর্ববঙ্গকে আলাদা মুসলমান প্রভাবিত ইসলামি বঙ্গপ্রদেশ সৃষ্টি করে। লক্ষ্য ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি, তার জন্য পাকিস্তান দাবির আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ লগ্নে ১৯৪৬ সালে এক ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট মাত্র ৬ কোটি মুসলমান ভারত ভাগ করে পাকিস্তান নামক ইসলামি দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়। এই হিংসাত্মক আন্দোলনে সহযোগী শক্তি হিসেবে মাদ্রাসার ভূমিকা প্রধান। এটাই আধুনিক ভারতে মাদ্রাসা স্থাপনে তাদের স্বপ্ন পূরণে ভারতবর্ষের দু' প্রান্তে দুটি ইসলামি দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

● এখনও তাদের দৃষ্টিতে সারা ভারতে ইসলামি শাসনের স্বপ্ন বাকি আছে। সেই লক্ষ্যে স্বাধীন ভারতে তারা কাশ্মীর দিয়ে শুরু করেছে এবং কাশ্মীর হিন্দু শূন্য করতে সমর্থ হয়েছে।

● মাদ্রাসার মাধ্যমে জেহাদি পরিকল্পনা ভারত স্বাধীন হওয়ার পরপরই শুরু করেছে। বিশেষভাবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে বসবাসরত পাকিস্তানি দোসর জেহাদিদের অতি সক্রিয়তা উত্তরপূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতে জেহাদি অনুপ্রবেশ বিগত ৫০ বছর ধরে ঘটে চলেছে। যার পরিণতিতে আজ উত্তরপূর্ব ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ, অসমে ৩৫ শতাংশ , পশ্চিমবঙ্গে ২৭ শতাংশ (১৯ শতাংশ) এবং পার্শ্ববর্তী নেপালে ৫ শতাংশ (২ শতাংশ)। সহজেই অনুমেয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা কী ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। এই অনুপ্রপ্রেশের কিছু প্রক্রিয়া বা পর্যায় আছে যা মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম, মৌলভি ও ইমামরা নীরবে পরিচালনা করে আসছে।

পর্যায় বা প্রক্রিয়া :

● তারা সহজ সরল পাহাড়ি জনজাতিদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আবার অনেকেই স্থানীয় মেয়েদের লাভজেহাদের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করছে এবং বেহিসেবি সন্তান উৎপাদন করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

● ভারতের অন্যান্য স্থানে থেকে কাজের সন্ধান গিয়ে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা ওই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

● এটা শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবী ব্যাপী এই প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম কর্মসংস্থানের জন্য যেভাবে হোক যে কোনো দেশে অনুপ্রবেশ করো। ধর্ম পালনের নামে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করো। স্থানীয়দের বিয়ে করো, সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করো। কোরান হাদিসের ভিত্তিতে ইসলামি শিক্ষা দিয়ে জেহাদি মগজধোলাই করে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলো। রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করো যা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, বুলগিরিয়া, বেলজিয়াম, স্পেন, সুইডেন, কানাডা, প্যারাগুয়ে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুরু হয়েছে। এই নীরব জেহাদি মুসলমানরা বিশ্বের সব দেশে মসজিদ মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঢুকে পড়ছে। ফিলিপাইন্স, থাইল্যান্ড জাপান ইন্দোনেশিয়া, তিউনিসিয়া, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, সুদান সিরিয়া ইয়েমেন, বসোনিয়া, কসোবা চেচনিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে যেসব সন্ত্রাসবাদী ইসলামি কার্যকলাপ চলছে তার মূলে রয়েছে মক্তব ও মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষা ।

সমস্ত প্রকার ইসলামি সন্ত্রাসকাজে মাদ্রাসা সক্রিয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে :

● মাদ্রাসা পড়াশোনা করা ছাত্ররা সর্বস্তরের মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মীয় আবরণে 'হুজুর' হিসেবে আস্থা অর্জন করে।

● ভারতবর্ষে যত ইসলামি সংগঠন আছে যেমন— মুসলিম লিগ, জামাত-ই ইসলাম, তবলিগ জামাত, জামাতই ওলেমা হিন্দ, SIMI, NDF, PFI AIMIM ,উকেমা পরিষদ, ইমাম সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ের মসজিদ মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত থাকে। এমনকী প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তাদের বিচরণ ক্ষেত্র। এই সমস্ত সংগঠনে মাদ্রাসার ছাত্ররা বিভিন্ন রকম ভূমিকা পালন করে , কিন্তু লক্ষ্য অভিন্ন — দারুল ইসলামের আন্দোলন সঙ্ঘটিত করা এবং সমস্ত প্রকার ইসলামি আন্দোলনে প্রধান সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করা ও উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ করা।

● এই মাদ্রাসার ছাত্রসমাজের সক্রিয় ভূমিকায় ভারতভূমিতে ওয়াহাবি,খিলাফত, ফরাসি, মাপেলা ও পাকিস্তানের দাবি প্রভৃতি হিংস্র ভয়ংকর ইসলামি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালে তারা কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দুদের রক্তে মাটি লাল করে দিয়েছিল। বর্তমানকালে শরিয়া আইন রক্ষা আন্দোলন, শাহাবানু মামলা, তিনতালাক বিরোধী আইন পাশ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, সিএএ এবং এনআরসি বিরোধী, এমনকী সলমন রুশদি ও তসলিমা নাসরিন বিরোধী ইসলামি আন্দোলনে মাদ্রাসার ছাত্রসমাজের সক্রিয় উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

● বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনে ও সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিরোধিতায় এবং সংখ হিন্দু নির্যাতন ও বিতাড়নে মাদ্রাসার শক্তিশালী ভূমিকা ইতিহাস খ্যাত। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলমান দেশসমূহে যে জেহাদি শক্তি পুনর্জন্ম এবং সব দেশেই যে কোনো ধরনের ইসলামি আন্দোলনে মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রসমাজের উপস্থিতি ও ভূমিকা অগ্রগণ্য।

মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান মূল লক্ষ্য হযরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা, কোরান হাদিসের শিক্ষা হলো ইসলামি শিক্ষার মূল কথা। একমাত্র ইসলাম, সত্য জগতের বাকি সব মিথ্যা ও ভুল। তাই সমস্ত মানব জাতিকে ইসলাম কবুল বা স্বীকার করাতে হবে এবং নবি মহম্মদ ও কোরান হাদিসের উপর আস্থা ও বিশ্বাস বা ইমান স্থাপন করতে হবে। ইসলামে আনুগত্য এনে মুসলমান হতে হবে। যারা ইসলাম স্বীকার ও গ্রহণ করবে না তারা সকলে অবিশ্বাসী, কাফের বা মুসরিক। তারা নিকৃষ্টতম পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। তাদের জন্য চরম শাস্তির বিধান রয়েছে। কোরান অনুসারে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করা মুমিন মুসলমানদের জন্য অবৈধ। মুসলমান শুধু মুসলমানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করবে, সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। অবিশ্বাসী ও অমুসলমানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করা অবৈধ, এমনকী তাদের মৃত্যুর পরও নয়। তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন প্রার্থনা করা হয়। এটাই ইসলামি শিক্ষা ও বিধান। মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য অবিশ্বাসী ও অমুসলমানদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ করে তাদের বিষয় সম্পত্তি লুটপাট করে দখল করা।

মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতে সরল কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিশু বয়স থেকে ধর্মীয় শিক্ষার নামে এরূপ জেহাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। যদি ছাত্র-ছাত্রীরা মাদ্রাসার কোরান হাদিশের শিক্ষা প্রকৃতভাবে আত্মস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করে তারা চরম জেহাদি মানসিকতা সম্পন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক।

ফলে অনুমেয়, মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অমুসলমানদের প্রতি বিনা কারণে এক প্রকার জেহাদি ঘৃণ্য হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে যা কোনো সভ্য দেশ ও সমাজের কাম্য নয়, বরং মারাত্মক ভয়ংকর। যে কোনো মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একান্তে আলোচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং যে কোনো প্রকার ইসলামি আন্দোলনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ভারতের জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ও তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও নির্লিপ্তভাবের কারণেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শত শত মক্তব ও মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। যা ভারতের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষায় ভয়ংকর প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। যে মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা আমাকে ঘৃণা বিদ্বেষ নির্যাতন নিপীড়ন করতে শিখাচ্ছে, আমার বিষয় সম্পত্তি লুট করছে, আমার ঘরে অগ্নি সংযোগ, আমার মা-বোনের উপর অত্যাচার, এমনকী আমাকে হত্যা করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই মাদ্রাসা আমার- আপনার কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। কী বিচিত্র আমাদের দেশ! ❚

সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণে হিন্দুবিদ্বেষী নেহরুর বিরোধিতা

ডাঃ আর এন দাস

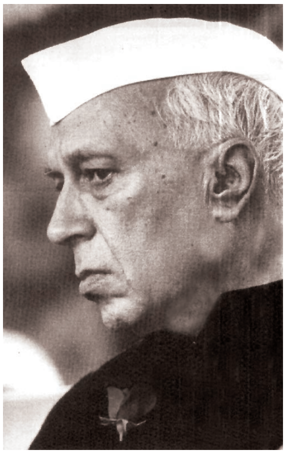

অতীতের সত্য ঘটনাগুলির নিখুঁত বিবরণ বা সমসাময়িক অবস্থার পর্যবেক্ষণই ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনোত্তর তথাকথিত বামপন্থী ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে বিকৃত করেই ক্ষান্ত হননি , বরং সত্যের অপলাপ করে রক্তাক্ত ইসলামিক ইতিহাসকে 'হোয়াইট ওয়াশ' করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন গত ৭০ বছর ধরে। অবশ্য তার পিছনে ছিল আন্তর্জাতিক গভীর ষড়যন্ত্র। হাজার বছরের গোলামির পর রক্তাক্ত ও দ্বিখণ্ডিত ভারতের প্রথম দূরদৃষ্টিহীন প্রধানমন্ত্রী 'পণ্ডিত' নেহরুর প্রশ্রয়েই ওই ঐতিহাসিকরা কেন্দ্রীয় অনুদানে পুষ্ট জামিয়া মিলিয়া, জেএনইউ বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ইতিহাসের নামে কল্পকাহিনি বা উপন্যাস লিখে চলেছিলেন। ইদানীং রামজন্মভূমি বিতর্কে ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, রামচন্দ্র গুহ, ডিএন ঝা ও বিপানচন্দ্রদের কদর্য ভূমিকা সবার গোচরে এসেছে।

এই তথাকথিত ঐতিহাসিকদের শেষ পর্যন্ত সত্যমেব জয়তের কাছে মাথা নোয়াতে হয়। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের সবথেকে প্রামাণ্য ইতিহাস। ইতিহাস শব্দের অর্থ হলো 'অতীতে যা বলা হয়েছিল'। আবহমানকাল ধরেই দেখে এসেছি দেবাসুরের সংগ্রামে দৈব শক্তির কাছে পাশবিক শক্তিসম্পন্ন দানবীয় শক্তির বারংবার পরাজয় ঘটেছে।

সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ গুজরাটের পশ্চিমতটে বেরাবলের কাছে প্রভাস পাটনে ঐতিহাসিক দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের সর্বপ্রথম সোমেশ্বর শিবের ঐশ্বর্যশালী মন্দিরটি হিন্দুদের আস্থা ও ধর্মের প্রতীক এবং গৌরবময় প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির পরিচায়ক ছিল। সোমনাথ মন্দিরের স্থাপনা, ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণের বিশদ বিবরণ ইতিহাসে লেখা আছে। অযোধ্যায় ৫ আগস্ট, ২০২০-তে প্রধানমন্ত্রী মোদীর রামজন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস করায় কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের গাত্রদাহ ও বিরোধিতা, ১৯৫১ সালের সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণে নেহরুর চরম বিরোধিতা হিন্দুরা ভুলতে পারে না। জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের চোখে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদের প্রেরক হলেও বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর কথায়, দূরদৃষ্টিহীন ও জেদি নেহরুজী ছিলেন স্বঘোষিত 'পণ্ডিত'।

শাস্ত্রে আছে, সৃষ্টির শক্তিপুঞ্জ বিনাশের চেয়ে অনেকগুণ বেশি হয়। বখতিয়ার খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র বছরের তপস্যার ফল ৯০ লক্ষ পাণ্ডুলিপি ১২০২ সালে কয়েকদিনের আগুনেই নিঃশেষ করে দিয়েছিল। অনাদিকাল থেকেই প্রবাসখণ্ডে কপিলা, হিরণ্য ও সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গমে নিরাকার জ্যোতিপুঞ্জের প্রতীক 'বিধু খণ্ডবিমণ্ডিত ভালতটং 'সোম বা অমৃতের ঈশ্বর' সোমেশ্বর শিবের মন্দিরটি সৌরাষ্ট্রে বিরাজমান ছিল। জে. গর্ডন, মেল্টনের বর্ণনায়, ৭২৫ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধের সুলতান আল-জুনেইদ প্রথমবার গুজরাট ও রাজস্থানের রাজাদের পরাজিত করে শিবলিঙ্গটি ধ্বংস করে। তারপর বহুবার ইসলামি আক্রমণে ধ্বংস হলেও স্থানীয় হিন্দুরা মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। গজনির সুলতান মেহমুদ ১০২৪-১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ বার সোমনাথ আক্রমণ করে মন্দির রক্ষাকারী ৫০ হাজার ভক্তকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২০ মিলিয়ন দিনারের সোনারুপা, মণিমাণিক্য, মূল্যবান চন্দনকাঠের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রগুলি অপহরণ করে আফগানিস্তানে পালানোর পথে ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৯) থেকে শুরু চরম হিন্দুবিরোধী ও মূর্তিধ্বংসকারী ঔরংজেব (১৭০২) পর্যন্ত বিধর্মী শাসক সোমনাথকে ধ্বংস করে অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করে।

অন্যদিকে যাদবরাজ বল্লভী, রাজা ভোজ ও মহীপাল, প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, শোলাঙ্কি-চালুক্য রাজাদের অন্যতম মূলারাজা, রাজা প্রথম ভীম, কুমারপদ প্রমুখ হিন্দুরাজা বারংবার ধর্মরক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মন্দির পুনরুদ্ধার করেছেন। মারাঠা মহারানি অহল্যাবাই হোলকর (১৭০০) শেষবারের মতো পুনঃসংস্কার করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাসকার মীনাক্ষী জৈনের লেখা থেকে এসব জানা যায়। তাছাড়া, আমীর খসরু ও জিয়াউদ্দিন বারনির লেখা থেকেও ভারতে হিন্দুমন্দির ধ্বংসকারী ইসলামি জিহাদের মর্মন্তুদ কাহিনির বর্ণনা পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশের ভোপালে রাজা ভোজের সময়ে তৈরি সারাবিশ্বের একমাত্র সরস্বতী মন্দিরটিকে মুসলমান ভোটভিখারি কংগ্রেসি সরকার মুসলমানদের মসজিদ বানানোর জন্য দিয়ে দেয়। আজও তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ১৯৪৭ সালে জুনাগড়ের নবাব মহব্বত খাঞ্জির পাকিস্তানে যোগদানের ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় সেনার সাহায্যে জুনাগড়কে ভারতে বিলয় করান এবং সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণে আচার্য কে.এম. মুন্সীকে নিয়োজিত করেন। জুনাগড়ে ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর সোমনাথ দর্শনে গিয়ে স্থানীয় জনসভায় সর্দার প্যাটেল বলেন, বর্তমান সরকার এই জীর্ণ মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হলেও ভারতকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়। দেশ বিভাজনকারী বিশেষ বর্গের কাছে হিন্দু স্বাভিমানের কোনো মূল্য ছিল না। সেই হিন্দুবিদ্বেষী বর্গের নেতা ছিলেন নেহরু স্বয়ং। তিনি ছিলেন সর্দার প্যাটেলের ভূমিকার প্রধান বিরোধী মুখ। বোম্বেতে সর্দার প্যাটেল একবার স্বেচ্ছাচারী নেহরুর যুক্তিহীন বিচারে ক্ষুণ্ণ হয়ে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের পরিকল্পনা করেন। মহাত্মা গান্ধীও বলেছিলেন, ইংরেজরা দেশ ছাড়লে কংগ্রেসের প্রয়োজন থাকবে না। কংগ্রেসের বিলয়ে দেশের মঙ্গলই হবে। কিন্তু রাজভোগে মত্ত নেহরু সহজে এই কথা মেনে নেবার পাত্র ছিলেন না। 'ভিপি মেনন ঃ দ্য আন সাং আর্কিটেক্ট অব মডার্ন ইন্ডিয়া'র লেখিকা ও ইতিহাসকার নারায়ণী বসু লিখেছেন, নেহরু সর্দার প্যাটেলকে তার মন্ত্রীসভায় নিতেই চাননি তাদের মধ্যে চলা শীতযুদ্ধের কারণে। কিন্তু ভাইসরয় মাউন্টব্যাটন বলেছিলেন, প্যাটেলকে বাদ দিলে মহামূর্খামি হবে। হ্যারি হডসনের লেখা থেকেও একথার পুষ্টি হয়।

পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণ করলে রাজা হরি সিংহের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নেহরু তাঁর বন্ধু শেখ আবদুল্লাকে জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করে ৩৭০ ধারা লাগু করেন। ভারতীয় সেনা যখন প্রতি আক্রমণে পাকিস্তানকে পরাজিত তাড়িয়ে লাহোরের পথে, সে সময় তিনি সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করেন। ১৯৪৭ সালে বালুচিস্তানের কালাত খানেদের এবং ১৯৫১ সালে নেপালের রাজা ত্রিভুবন নারায়ণ শাহের ভারতে বিলয়ের প্রস্তাবও নেহরু প্রত্যাখান করেন। এর বিষময় ফল দেশকে ভোগ করতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ওমানের সুলতান গ্বাদার বন্দর ভারতকে দিতে চাইলে নেহরু নেননি। বঙ্গোপসাগরে ১৯৫০ সালে কোকো দ্বীপপুঞ্জকে হাতে পেয়েও তিনি বর্মাকে দান করেন। চীনা নৌবাহিনী সেটা কিনে ভারতের উপর নজরদারি করছে। কথিত আছে, নেহরু ১৯৫২ সালে মণিপুরের ২২৩২৭ বর্গকিমি কাবাও ভ্যালি বর্মাকে বিক্রি করে দেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে চীন কারাকোরাম ও লাদাখের ৪৩,০০০ বর্গকিমি দখল করলে নেহরু বলেন, ওখানে শুকনো ঘাসের একটি পাতাও জন্মায় না। আমেরিকা ১৯৫০ সালে ভারতকে আণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ীপদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে দূরদৃষ্টিহীন ও জোটনিরপেক্ষতার প্রতিমূর্তি নেহরু সদস্যপদটি কমিউনিস্ট চীনকে দিয়ে দেন। এত ঘটনার পরও মানুষ কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের ভোট দিয়ে ৭০ বছর ধরে দেশকে লুট করতে সাহায্য করেছে। তাইতো এন ডি তিওয়ারী, মণিশংকর আয়ার ও দিগ্বিজয় সিংহরা-ই নেহরুর যোগ্য উত্তরসূরি হয়েছেন।

সর্দার প্যাটেল জুনাগড়ের জনসভায় বলেছিলেন, শুধু মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হবে না, মূর্তি স্থাপনের মধ্যে দিয়েই হিন্দুর মনে স্বাভিমান ও সম্মান ফিরে আসবে যা এতদিন মুসলমান শাসকের ইসলামি শাসনতন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়েছিল। নেহরু আবার সেই একই পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হলেন যাতে মন্দিরের পুনর্নির্মাণ বন্ধ করা যায়। তাঁর যুক্তি ছিল, এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারে মুসলমানদের আস্থায় চোট পৌঁছবে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপেক্ষা করা হবে, অথচ সাঁচীর বৌদ্ধ মন্দির এবং দিল্লির পুরানো মসজিদের পুনর্নির্মাণে সরকারি তহবিল থেকে মুক্তহস্তে দান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের এহেন দুর্দশা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। হিন্দুর চোখে ধুলো দিয়ে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা গত ৭০ বছর লুটপাট চালিয়েছে। আজও হিন্দুরা সেই কংগ্রেসকে অন্ধবিশ্বাসে ভোট দিয়ে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে।

যাইহোক, সর্দার প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে হার মানলেও নেহরু হিন্দুজনতার ট্যাক্সে ভরা সরকারি তহবিলের এক পয়সাও হিন্দুমন্দির নির্মাণে ব্যয় হতে দিলেন না। কিন্তু অসমসাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কানহাইলাল মানেকলাল মুন্সিজী, যিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, বিদ্বান, শিক্ষাব্রতী, ভারততত্ত্ববিদ ও গান্ধীবাদী কংগ্রেসের একনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী, তিনি হিন্দুদের কাছে দানের জন্য আবেদন করলেন। মুন্সিজী বম্বেতে ভারতীয় বিদ্যা ভবন নির্মাণ করে ভারতের বিকৃত ইতিহাসকে পুনর্লিখনের প্রয়াস জারি রাখেন। ইতিহাসকার রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস'-এর সম্পাদনা করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। রিক্ত ও রক্তাক্ত ভারতের দীনহীন হিন্দুর উদার দানেই গড়ে উঠেছিল আজকের ভব্য ও বিশালাকার সোমনাথ মন্দিরটি।

পক্ষান্তরে, এয়ার পোর্টের কাছে মমতা ব্যানার্জি নির্দ্বিধায় হিন্দুর ট্যাক্সের টাকায় সরকারি তহবিলের ১০০ কোটি টাকা সংবিধানকে কাঁচকলা দেখিয়ে 'হজ হাউস' করে দিয়েছেন। এরই নাম সেকুলারিজম। ভারতে যত মসজিদ আছে সবই তৈরি হয়েছে হিন্দুমন্দির বা জমির উপর সরকারি অনুমোদনে। জঙ্গিপুরের বিকাশবন্ধু পালকে হত্যা করে তার ১৭ কাঠা জমির উপর ভব্য মসজিদ হবে। বাংলাদেশে ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলির মন্দির ও বাড়িটি শত্রুসম্পত্তি ঘোষণা করে এক বিশাল মসজিদ বানানো হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের রায়ে রামমন্দির তৈরি হলেও তৃণমূল নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও আসাউদ্দিন ওবেসিরা তাকে গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছেন।

সর্দার প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধীর অকাল নিধনে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে মুন্সিজীর উপর। নেহরু মুন্সিজীকে ধমকের সুরে বলেছিলেন, মুন্সিজী আপনি যে মন্দির সংস্কারের কাজ করছেন সেটা একেবারে হিন্দু-পুনরুত্থানের মতো হচ্ছে, যা আমার একেবারেই অপছন্দ। সুতরাং এর থেকে আপনি নিবৃত্ত হন। মুন্সিজী ক্রোধান্বিত হয়ে স্থান ত্যাগ করে এক দীর্ঘ পত্রে লিখেলেন, সোমনাথ মন্দির হিন্দুর সম্মান ও স্বাভিমানের প্রতীক। স্বাধীনোত্তর ভারতের সংকটপূর্ণ অবস্থায় দেশবাসীর আস্থা সুদৃঢ় করা ও আত্মশক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। এই চিঠি পড়ে তৎকালীন গৃহসচিব নেহরু ও প্যাটেলের ঘনিষ্ঠ ও মধ্যস্থতাকারী কেরলীয় কূটনীতিজ্ঞ ভিপি মেনন বলেন, আমি আপনার এই ঐতিহাসিক চিঠি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার এই অদম্য প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। গান্ধী ('৪৮) ও প্যাটেলের ('৫০) অকাল প্রয়াণে, মুন্সিজী ও মেননের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি মন্দিরের উদ্ঘাটন সমারোহে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে যোগদান থেকে নিবৃত্ত করার যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যান নেহরু। প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সনাতনী হিন্দু। ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতে হতমনোবল হিন্দুর দুর্দশার কথা তিনি ভালোই বুঝেছিলেন। তাই নেহরুর বিরোধিতা ও হুমকি অগ্রাহ্য করেই সোমনাথে উপস্থিত হয়ে এক ওজস্বী ভাষণ দেন। তখনকার সমস্ত সংবাদমাধ্যমে প্রশংসা-সহ ভাষণ প্রকাশিত হলেও নেহরুর কড়া নির্দেশে 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো' নিশ্চুপ ছিল। ভাষণে তিনি নেহরুর প্রতি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'বিষ্ণুর নাভিনির্গত ব্রহ্মার উৎপত্তির মতোই প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত অটুট বিশ্বাস ও আস্থাকে পৃথিবীর কোনো অস্ত্র, শক্তি, সম্রাট বা সেনা নিঃশেষ করতে পারবে না'। প্রতিহিংসাপরায়ণ নেহরু রাজেন্দ্রপ্রসাদের শেষজীবনটা অত্যন্ত বিষময় করে তুলেছিলেন । অবশেষে ১৯৬৩ সালে পাটনার সাদাকাত আশ্রমে বিনা চিকিৎসায় মারা যান অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

গৌরবশালী প্রাচীন ভারতে সম্পদের অভাব ছিল না। ওই সম্পদের ভাণ্ডার ছিল হিন্দু মন্দিরগুলিতে রক্ষিত অপার সোনা-মণিমুক্তার কোষাগার। সারাবিশ্বের ২৫ শতাংশ সোনা কেরলের পদ্মনাভন ও অন্ধ্রের বালাজী মন্দিরেই রক্ষিত আছে। সেটা জানতো বলেই বিদেশি আক্রমণকারীরা হিন্দু মন্দিরগুলিকে লুট করতো। আজও সেই ট্র্যাডিশন সমান তালে চলছে। আজও কেরল ও অন্ধ্রে মন্দিরগুলিকে মুসলমান ও খ্রিস্টান শাসকরা হস্তগত করে ধন লুট করে চলেছে। অতীতে রক্তপাত করে তরবারির জোরে, আজ বিনারক্তপাতে আইনের জোরে, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লুটের সেই ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত আছে। সর্দারজী দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, সোমনাথ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারের সঙ্গে হতোদ্যোম হিন্দুর আস্থা ও বিশ্বাসেরও আজ জীর্ণোদ্ধার হলো। বামপন্থী ঐতিহাসিকরা পাকিস্তানিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছেন, নেহরু একজন সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। আচার্য মুন্সিজী তার বিখ্যাত পুস্তক, 'জয় সোমনাথ'-এ আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'ভারতের রাজনীতিতে ভোটভিখারি কিছু রাজনেতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধার্মিক ও সামাজিক সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতে বহুসংখ্যক জনসমুদায়ের আস্থা ও বিশ্বাসকে বিধ্বস্ত করেছেন। কখনও কখনও সনাতন ধর্মে এলার্জিযুক্ত তথাকথিত হিন্দুনামধারী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনেতারা অকারণে হিন্দুধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙিয়ে তুলছেন। সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণে যেন সেটাই প্রতিপন্ন হয়েছে'। ■

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্‌অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। —*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

ভারত সেবাশ্রম
সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

অন লাইনই আজ আমার বিদ্যালয়

বিমল কৃষ্ণ দাস

করোনা সরাসরি আক্রমণ করেছে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে। পরোক্ষে আক্রমণের বড়ো শিকার হয়েছে আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্র। করোনার হাত থেকে মানুষের জীবন রক্ষায় বিশ্বজুড়ে আজ চলছে নানা গবেষণা, প্রচেষ্টা, পরামর্শ ও প্রয়োগ। নিঃসন্দেহে এটি এখন সর্বোচ্চ সর্বাগ্রগণ্য বিষয়। কিন্তু রোগ যুক্ত কী মুক্ত বাঁচার জন্য খাদ্য অর্থ সর্বদাই প্রয়োজন। দীর্ঘ লকডাউনে অনেক পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য তলানিতে। তাই শুরু হয়েছে আনলক এক, দুই। শুধু এদেশে নয় অন্য দেশেও এই পর্যায়ে চলছে নানা প্রকারের চিন্তা, পরিস্থিতি সমীক্ষা, নতুন পরিকল্পনা ও রূপায়ণে পদক্ষেপ গ্রহণ। সমাজকে সচল রাখতে আর্থিক পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে গেলে তার প্রভাব যেমন সর্বত্রগামী তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও পঠনপাঠন নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকারাও যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তার প্রভাবও হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী। তবে শিক্ষার উপরে করোনার আক্রমণে উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ মানুষরা কিন্তু চিন্তা, ক্রিয়াশীলতা, সাহচর্য দিয়ে অনেকটা সুরাহার করতে পারি।

আজ যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে বা নিত্য পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে ছাত্র-অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় পরিচালক- মণ্ডলী সকলে যেন এক দিশাহীনতার সম্মুখীন। কী করবে, কীভাবে করবে, কী হবে কোনো স্পষ্ট ছবি যেন সামনে ধরা দেয় না। এই অবস্থায় সরকার বা স্কুল বা অন্য কারও খুব বেশি দোষ গুণ বিচারের সময় নেই, উচিতও নয়। এখন প্রয়োজন নিজ কর্তব্য পালন, শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রাখা, তাদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখা। দুটো শব্দ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ— আত্মবিশ্বাস ও মনোবল। যে কোনো সংকট থেকে মুক্তি পেতে এর ভূমিকা তুলনাহীন। এরা এনে দেয় পথের নিশানা, এনে দেয় নির্ভীকতা , লক্ষ্যপথে চলার কৌশল। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং আমরা যারা বড়ো তাদের মনে আগে এই আত্মবিশ্বাস, চলতে শুরু করে। আমাদের মধ্যেকার পরিপক্ব এই ভাবটিকে সঞ্চারিত করতে হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— যেমন 'জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা প্রজ্বলিত হয়, তেমনি

আত্মবল জাগরণের প্রয়োজন

কথায় কথায় বলতে শোনা যায়— কী করে বড়ো হব, আমাকে তো আর তুলে ধরার কেউ ছিল না। কে কাকে তুলে ধরবে! আর ধরবেই বা কেন? কারণ ওঠার শক্তিতো তোমার মধ্যেই আছে। যারা উঠেছে তারা নিজের শক্তিতেই উঠে দাঁড়িয়েছে। কখনও কেউ হাত ধরে দু' একবার দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারে কিন্তু বাকি চলার কাজ সে নিজেই করে। এক সময়কার দুর্বল শিশু এমনি ভাবেই

একটি প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হয়'। এই সময় বিদ্যালয় নেই, সামনে শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই, একা একা কী করে শিখব! এটি যেন আজ সবার মনের কথা বা ভাবনা। আচ্ছা, শিক্ষক-শিক্ষিকা কী কাউকে শেখাতে পারেন? না, তিনি বা তাঁরা সাহায্য করেন মাত্র। যে যা শিক্ষা লাভ করে প্রকৃতপক্ষে সে একাই করে।

একলব্যের গল্প আমরা সকলে জানি, নিত্য পঠনপাঠন, কোনো বিশেষ অনুশীলনের কাজ কিন্তু আমরা একা থেকেই করতে চাই।

এইজন্য একা আলাদা ঘরে পড়তে বসি, একা কোথাও বসে ছবি আঁকি, একাই গান করি। ভাই-বোন, বন্ধুদের কতবার বলতে হয়— ‘পড়ার সময় একটু একা থাকতে দে’। কারণ কাজটি আমি নিবিষ্ট মনে একাগ্রতার সঙ্গে করতে চাই। এটাই শিক্ষা লাভের একমাত্র পথ। অন্য প্রাণীদের কথা ভাবি না কেন! পাখির ছানাকে উড়তে শেখার জন্য কোনো স্কুলে পড়তে হয় না। ব্যাঘ্রশাবক বড়োদের সঙ্গে থেকেই শিকার ধরার কৌশল রপ্ত করে। অপরদিকে নিজে থেকেই প্রত্যেক প্রাণী অর্জন করে ফেলে তার আত্মরক্ষার পদ্ধতি। এমন হাজারো বিষয় রয়েছে। মানব শিশুর মধ্যেও এমন সামর্থ্য বর্তমান। ঈশ্বরের দানে তার সে সামর্থ্য অসীম, অসীম তার চিন্তা শক্তি। তাই মানবজাতির এতো অগ্রগতি। সেই পারিপার্শ্বিকতা থেকে প্রেরণা নিয়ে অন্তঃশক্তিকে জাগিয়ে তোলে, তাই-ই তার কাছে শিক্ষা, আর এ কাজ সে করে, একদম একা। ঋষি দত্তাত্রেয় চব্বিশজন যে গুরু নির্ধারণ করেছিলেন তা দূর থেকে তাদের আচরণ, কর্ম-রূপ দর্শন করে মাত্র। আমরা প্রায় সবাই সে কবিতা পড়েছি— ‘আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে...’। পথ চলতি সাধারণ এক মানুষের একটি কথায় হয়তো জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেক বই নয়, কোনো শিক্ষকের একটি কথায় হয়তো সেই ছাত্রের জীবন দর্শন, জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। অর্থাৎ নিজের ভিতরের সামর্থ্য সে নিজেই প্রকাশ করবে, বাইরের কারও সহযোগিতা, প্রেরণা, দৃশ্য, ঘটনা অনুঘটকের কাজ করে মাত্র। তবে এই সমস্ত তখনই সম্ভব হয় যদি সে স্বচ্ছ এক নির্মল মনের অধিকারী হয়। সমস্যা সব এখানে। চঞ্চল, সঙ্কুচিত, ভীরু, উদ্বিগ্ন মন সহজে তেমন কিছু গ্রহণ করতে পারে না। শিক্ষকমহাশয় কত পড়াচ্ছেন, সেও পড়ছে, কিন্তু কার্যকরী হচ্ছে না। পাত্রের মুখ বন্ধ রেখে উপরে জল ঢাললে সে জল পাত্রের ভিতরে পৌঁছবে না। এখানেই আজ শিক্ষার্থীর মনকে তৈরি করা, মনকে সতেজ রাখা, মনে সত্যের উপলব্ধি করানো আমাদের বড়ো কাজ। বিদ্যালয় বন্ধ, সবার সঙ্গে চাক্ষুষ যোগাযোগ, কথাবার্তা বন্ধ, খেলা নেই, বন্ধু নেই— একা। এ এক ব্যতিক্রমী সংকটময় পরিবেশ। এমন সংকট ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে নানা সময়ে আসে কিন্তু তা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। তবে তাকে সাহসের সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। কবি বলেছেন— ‘সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান। সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ”। একেবারে চিরকালীন একটা সত্য কথা। ভয় নয়, ভয়কে জয় করাই আমাদের ইতিহাস। অতএব লড়তে হবে। আর এই তো সুযোগ, কঠিন এক উদাহরণ তৈরি করে জীবনটাকে গড়তে হবে। এখন না হয় রাত্রির অন্ধকার। কিন্তু সূর্যতো উঠবেই, এ বিশ্বাসই আমাদের জীবনকে গতিশীল রাখে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমি দেখেছি শিক্ষার্থীরা কিন্তু অনলাইনে বেশিরভাগই উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনার কাজ করে যাচ্ছে। অপূর্ব সব হাতের কাজ করে পাঠাচ্ছে তারা। নানা অনুষ্ঠান করছে। নিত্য বাড়ির কাজ দিচ্ছে। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে দারুণ করল সবাই। হিসেবে দেখা গেছে যত শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে, দু’ চারজন করে মোট যত দর্শক, শ্রোতার সংখ্যা হয়েছে তত সংখ্যায় উপস্থিতি স্কুলে অনুষ্ঠান হলে সম্ভব হতো না।

অতএব সুন্দরের, সফলতার এই ছবি নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সামনে নেই কিন্তু শিক্ষক- শিক্ষিকা, বিদ্যালয়, অন্য শিক্ষার্থীরাও যে সঙ্গে রয়েছে তা তারা কিন্তু নিত্য অনুভব করে। তাই এই সময়ে ওদের এই উজ্জীবিত মনগুলোকে ধরে রাখাই আমাদের সকলের বড়ো কাজ। নাই নাই, কী হবে, সব বন্ধ— এসব নেতিবাচক কথা দিয়ে ওদের হতোৎসাহ, উদ্বিগ্ন না করাই আমাদের বর্তমান প্রধান কর্তব্য। যদি এটুকু করতে পারি তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ‘ওরা পড়বে, ওরা লড়বে, ওরা গড়বে। ‘করোনা’রে করে প্রতিহত ওরা আজকের এ ক্ষত ভরবে’।■

বিশেষ প্রতিবেদন

করোনাকালে পরীক্ষাসঙ্কট ও বিতর্ক

নির্মল মাইতি

বর্তমানে করোনা সংক্রমণের সময় পরীক্ষা বেশ স্পর্শকাতর বিষয়। এর মধ্যে আদালত ও রাজনীতির স্পর্শে তা আরও জটিল ও বিতর্কের হয়েছে। দু' ধরনের পরীক্ষা—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারির মতো উচ্চ পেশার পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য JEE (Joint Entrance Examination) এবং NEET (National Eligibility com Entrance Test) পরীক্ষা এবং ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্র দীর্ঘ সময় শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কারণে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ পরীক্ষা স্থগিত বা বাতিল করার পক্ষপাতী এবং সুপ্রিম কোর্টে ওই দু' ধরনের পরীক্ষা স্থগিতের আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে।

জিইই ও এনইইটি পরীক্ষা :

এগুলি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। পরীক্ষায় বসাটা ঐচ্ছিক। কিন্তু কেরিয়ার বা পেশার তাগিদ রয়েছে। জুলাই মাসে এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে তা পিছিয়ে সেপ্টেম্বরে করা হয়েছে। জেইই ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং এনইইটি ১৩ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য হয়েছে। ১৭ আগস্ট মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত জাস্টিস অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারকের বেঞ্চ জেইই ও এনইইটি মামলায় রায় প্রদান করেছেন। তাতে তাঁরা পরীক্ষা স্থগিতের কোনো নির্দেশ দেননি। ছাত্রদের পেশা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষা বাতিল হলে ছাত্রদের জীবনের মূল্যবান এক বছর নষ্ট হবে। তাই এনটিএ (ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি)-কে যথাসময়ে নির্ধারিত দিনগুলিতে পরীক্ষা নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে করোনা সংক্রান্ত সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই পরীক্ষা নিতে হবে।

ইতিমধ্যে ২৭ আগস্ট সোনিয়া গান্ধীর ডাকা অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আন্তর্জাল সভায় ঠিক হয় জেইই এবং এনইইটি স্থগিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে রায় পর্যালোচনা করার জন্য আবেদন করা হবে। তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ-সহ ছয়টি রাজ্যের পক্ষ থেকে (অন্যগুলি হলো রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র) ২৮ আগস্ট সম্মিলিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু তার উপর সুপ্রিম কোর্ট কোনো শুনানি করেনি। ইতিমধ্যে ২৮ আগস্ট কংগ্রেসের ছাত্র ইউনিয়ন এনএসইউআই এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ অবস্থান বিক্ষোভ করেছে। এই অবস্থার মধ্যে এনটিএ আন্তর্জালে অ্যাডমিটকার্ড ছেড়ে দিয়েছে এবং ছাত্ররা অন্তর্জাল থেকে তা সংগ্রহ করছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি এবং করোনা নিমিত্ত পরীক্ষা স্থগিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেন। বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীও পরীক্ষা স্থগিতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই হবে। ওড়িশা সরকার ছাত্রদের জন্য ফ্রি যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন এবং অভিভাবকদের হোটেলের বন্দোবস্ত করেছেন। এই উদ্দেশ্যে লকডাউনও শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৩১ আগস্ট লকডাউন হওয়ায় জেলা ছাত্রদের যাতায়াতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে সরকারও ফ্রি যানবাহনের ব্যবস্থা করেছে।

এনটিএ ও করোনা মোকাবিলায় সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে সংখ্যা জেইই-তে ৫৭০ থেকে বাড়িয়ে ৬৬০ এবং এনইইটি-এ কেন্দ্র সংখ্যা ২৫৪৬ থেকে বাড়িয়ে ৩৮৪৩ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ৯৯ শতাংশ ছাত্রই তাদের প্রথম পছন্দের কেন্দ্র পেয়েছেন। জেইই-তে কম্পিউটার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হবে। জেইই-তে ৮ ক্ষেপের পরিবর্তে ১২ ক্ষেপ করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেপে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ১.৩২ লক্ষ থেকে কমিয়ে ৮৫০০০ করা হয়েছে। দুই পরীক্ষার্থীর মধ্যে একটি আসন ছাড়া থাকবে। এনইইটি-এ কাগজে কলমে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কক্ষ প্রতি পরীক্ষার্থী সংখ্যা ২৪ থেকে কমিয়ে ১২ করা হয়েছে। উল্লেখ্য জেইই-তে ৮.৫৮ লক্ষ এবং এনইইটি-এ ১৫.৯৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী রয়েছে।

ইউজিসি পরীক্ষা :

করোনা সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পাদন ও শিক্ষাসূচি গঠন ব্যাপারে প্রফেসর আর সি খুলাড, প্রাক্তন ইউজিসি সদস্য ও হরিয়ানা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তার সুপারিশ অনুসারে ২৯ এপ্রিল ইউজিসি এক নির্দেশনা জারি করে। তাতে বলা হয়, মধ্যবর্তী বর্ষ বা সেমিস্টারের ছাত্রদের জন্য পরীক্ষা দরকার নেই। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং পূর্ব বর্ষ বা সেমিস্টারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে একজন ছাত্রের ফল নির্ধারিত হবে। প্রথমবর্ষ বা সেমিস্টারের ক্ষেত্রে শুধু অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ফল নির্ধারিত হবে। কিন্তু অন্তিম বর্ষ বা সেমিস্টারের ছাত্রদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষাই একজন ছাত্রের যোগ্যতার মাপকাঠি। তাছাড়া এই পরীক্ষা ফলের উপর ভিত্তি করে অনেকেই বিদেশে পড়তে যাবে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া জরুরি। এই পরীক্ষা অনলাইন-অফলাইন বা উভয়ের সমন্বয়ে হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সুবিধানুসারে এই পদ্ধতিকে সরল করে নেবে। এই পরীক্ষা জুলাইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

করোনা এবং লকডাউন জনিত কারণে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে সেই সময় আরও পিছিয়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে বলা হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু ছাত্র, অভিভাবক এবং বুদ্ধিজীবী সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। মহারাষ্ট্রের শিবসেনার যুব শাখা খুব সেনাও এই মামলায় শামিল হয়। ইতিপূর্বে দিল্লি ও মহারাষ্ট্র সরকার Disaster Management Act অনুসারে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছিল। ইউজিসি তাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ করে। এই রাজ্যগুলিও মামলায় পক্ষ হয়। অনেকগুলি শুনানির পর ২৮ আগস্ট সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্টের সামগ্রিক রায় প্রকাশিত হয়। জাস্টিস অশোক ভূষণের নেতৃত্বে তিন বিচারকের বেঞ্চ এই রায় দেন।

তাতে সুপ্রিম কোর্ট ইউজিসি-কে পরীক্ষা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং অন্তিম বর্ষ বা সেমিস্টারের ছাত্রদের জন্য পরীক্ষা আবশ্যিক ঘোষণ করে। Disaster Management Act অনুসারে কোনো রাজ্য পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করতে পারে না। তারা চাইলে ওই আইনে ইউজিসি-র অনুমোদনক্রমে পরীক্ষার দিন পেছতে পারে। কিছু ছাত্র অভিযোগ করে অন্তিম বর্ষের ছাত্রদের প্রতি ইউজিসি বৈষম্য করছে। কারণ মধ্যবর্তী ছাত্ররা পরীক্ষা না দিয়েই পরবর্তী বর্ষ বা সেমিস্টারে উত্তীর্ণ হচ্ছে। কোর্ট তা খারিজ করে দিয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা কোর্টকে জানান ৮১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট তাঁরা পেয়েছেন। (এর মধ্যে ১২১টি Deemed, ২৯১টি নিজ এবং ৫১টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।) উল্লেখ্য, ভারতে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫০টি। ৮১৮টির মধ্যে ৬০৩টি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মধ্যে ২০৯টি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে এবং বাকি ৩৯৪টি বিশ্ববিদ্যালয় সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করবে। সব রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই রায় অনুসারে পরীক্ষা নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে অক্টোবরে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করার কথা ভাবা হচ্ছে।

বেশিরভাগ ছাত্র সবসময়ই পরীক্ষাকে ভয় পায়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। টিভি ও মিডিয়া এরকম ছাত্রদের সাক্ষাৎকার ও বিবৃতি দিয়ে বাজার গরম করছে। অপদিকে ঐকান্তিক ছাত্ররা কিন্তু এই পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে। অন্তিম বর্ষের ছাত্ররাও পরীক্ষা ছাড়া উত্তীর্ণ হলে ভবিষ্যতে এটি একটি খারাপ নজির হয়ে যেত এবং পরীক্ষা সম্পর্কে ছাত্রদের লঘু মানসিকতা তৈরি হতো। এগুলির ফল মোটেই শুভ নয়।

করোনা সারা বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। তার জন্য তো জীবন পুরো স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না। করোনা কবে শেষ হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের রায় খুবই বাস্তবোচিত। মাথার যন্ত্রণা হলে মাথা কেটে দেওয়াটা সমাধান হতে পারে না। করোনার ক্ষেত্রে ভয় মারাত্মক ক্ষতিকর। করোনাতে এমনিতে কম, বিশেষ করে তরুণদেরকে সেভাবে করোনা কাবু করতে পারেনি। পরীক্ষা এড়িয়ে গিয়ে এই ভয়কে জয় করা যাবে না, করোনাকে চ্যালেঞ্জ করেই তরুণরা আত্মবিশ্বাসী হবে। তবে একটি প্রশ্ন ওঠে গেছে, বিরোধীরা কেন এত দেরি করে জেইই-এনইইটি স্থগিত করার আবেদন করল? শুধুই কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য? ■

সুস্বাস্থ্য

করোনাকালে মানসিক চাপ থেকে একমাত্র মুক্তির উপায় হলো যোগানুশীলন

আশীষ পাল

চিতা চিন্তাদ্বয়ো মধ্যে চিন্তা নামঃ গরীয়সী

চিতা দহতি নির্জিবং, চিন্তা প্রাণৈঃ সহ বপুঃ।। (উপনিষদ)

আমরা যদি তুলনা করি চিতা ও চিন্তার মধ্যে কে বড়ো। তখন বলা হবে চিতা শুধু নির্জীব শবকেই দহন করে, আর চিন্তা দেহ ও প্রাণকে দগ্ধ করে।

আমরা যদি একটু ভাবি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ হলো দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তার ফলেই হয় টেনশন বা মানসিক চাপ। কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই এই রোগের শিকার হতে পারে। আজকাল ভদ্র ভাষায় এই রোগের অন্য একটি নাম হচ্ছে Mental Stress বা মানসিক চাপ।

আমাদের মস্তিষ্কের দুটি অংশ এ ব্যাপারে দায়ী। একটি হলো সেরিব্রাল কর্টেক্স যা চিন্তা করতে সাহায্য করে, বাইরের উত্তেজনা গ্রহণ করে স্মরণ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। আর দ্বিতীয় হলো হাইপ্রো থ্যালাসাস। এই হাইপো থ্যালাসাস দেহের বিভিন্ন অংশের স্বয়ংক্রিয়তাকে চালনা করে। যেমন হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেরিস্টলসিস, শ্বাস চালনার ক্ষেত্রে ফুসফুসের সংকোচন- প্রসারণ ইত্যাদি। হাইপো থ্যালাসাসের এই স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্র আবার সিমপ্যাথিটিক ও প্যারাসিস-প্যাথেটিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সিমপ্যাথেটিক অংশ হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের গতি বাড়িয়ে দেয়। প্যারাসিসপ্যাথেটিকের কাজ এর বিপরীত।

কারণ : এই রোগ মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে। আবার পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক চাপে সৃষ্টি হয়। যেমন, ছেলে-মেয়েদের উপর পড়াশোনার চাপ, আর্থিক সঙ্গতির টানাপোড়েন। এছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ, নেশার আসক্তি, দারিদ্র্য ইত্যাদি।

লক্ষণ : মস্তিষ্কের উত্তেজনায় মাথাগরম দয়ে যাওয়া, চামড়া কুচকে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, মহিলাদের ক্ষেত্রে হঠাৎ ঋতু বন্ধ হওয়া, ঘুম কম হওয়া ইত্যাদি।

মুক্তি পাওয়ার উপায় : মানসিক টেনশন বা স্টেস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো নিয়মিত হাঁটা, কিছু খালি হাতে ব্যায়াম, আসন ও প্রাণায়াম করা । ক্রম অনুসারে বর্ণনা দেওয়া হলো।

• **প্রথম অভ্যাস :** ভ্রমণ প্রাণায়াম ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভোরবেলায় শ্বাসের সঙ্গে হাঁটা।

• **দ্বিতীয় অভ্যাস :** বক্ষ সঞ্চালন ২ থেকে ৩ মিনিট। দাঁড়িয়ে দু' হাত সামনে, তারপর দু' হাত প্রসারিত করা, দু' হাত কাঁধের সঙ্গে সমান্তরাল।

• **তৃতীয় অভ্যাস :** সেতুবন্ধন আসন ২ মিনিট। চিৎ হয়ে শুয়ে দু' পা ভাঁজ করে, দু' হাত শরীরের পার্শ্বে রেখে নিতম্ব তোলা। (নিতম্ব উঠানো নামানো ১০ বার)।

• **চতুর্থ অভ্যাস :** বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট। দেওয়ালের সাহায্য নিয়ে দু'পা কোমর থেকে উপরে উঠানো। (সর্বাঙ্গাসনের মতো)

• **পঞ্চম অভ্যাস :** চন্দ্র অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম ৩ মিনিট। সুখাসনে বসে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ডান নাকের নাসারন্ধ্র বন্ধ করা, বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও খুব ধীর গতিতে ছাড়া।

• **ষষ্ঠঅভ্যাস :** শিতলী প্রাণায়াম ৩ মিনিট। সুখাসনে বসে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া। জিব পাখির ঠোঁটের মতো হবে। তারপর দু' নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া।

• **সপ্তম অভ্যাস :** নাভি শুদ্ধি প্রাণায়াম ৫ মিনিট। সুখাসনে বসে নাসিকা মুদ্রায়, বাম নাক থেকে শ্বাস নেওয়া। তারপর ডান নাক থেকে শ্বাস ছাড়া। তারপর ডান নাক থেকে শ্বাস নিয়ে বাঁম নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া। এটা ১ চক্র হলো। এভাবে ৯ চক্র করা। শ্বাস নেওয়ার সময় ২ থেকে আড়াই সেকেন্ড শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া।

• **অষ্টম অভ্যাস :** ভ্রামরী ২ মিনিট ।সুখাসনে বসে দুই কানের ফুটো নির্দেশিকা আঙুল দিয়ে বন্ধ করা। জিব তালুর উপর স্পর্শ করে দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে ইংরেজির 'এন' উচ্চারণ করা। কম করে ৮ থেকে ১০ বার।

শেষে শবাসন/যোগ নিদ্রা ৫ থেকে ১০ মিনিট । শান্তিমন্ত্র পাঠ করে স্থান ত্যাগ করা।

শুধু আসন করলেই হবে না, তার জন্য সহজপাচ্য সাত্ত্বিক আহার গরেহণ করা। যতদূর সম্ভব সংযত জীবনযাপন এই রোগের পরম ওষুধ। এছাড়া মাঝে মাঝে ভ্রমণে যাওয়া। ▌

www.edengroup.in
EDEN
HURRY!!
Limited Period Offer
7Lacs
Onwards
1 RK
1/2 BHK
Meghbalika
Only 1% GST
Between Rajpur & Baruipur, Khasmullick
Adda Zone
Swimming Pool
Landscape Garden
HIRA/P/SOU/2018/000209
https://hira.wb.gov.in/
AC Banquet Hall | AC Gymnasium | Outdoor Kid's Play Area
Toddlers Play Area | Guest Room | Senior Citizen Zone | Rock Climbing | Home Theater
Card Room | Art Walk with Bengal Art & Sculpture
98306 26262

www.edengroup.in
EDEN RICHMOND PARK
READY TO MOVE
NO GST
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
24.50 L Onwards
• 2/3 BHK •
Near Narendrapur
(Atlas More, Kodalia)
NEW LAUNCH
EDEN RICHMOND ENCLAVE
14.47 L Onwards
• 1/2/3 BHK •
Landscape Garden | AC Community Hall | Swimming Pool | Gymnasium & Spa | Home Theater Room | Children's Play Room | Games Room
Eden Richmond Park: HIRA/P/SOU/2019/000603 • http://hira.web.gov.in
Eden Richmond Enclave: HIRA/P/SOU/2018/000240 • http://hira.web.gov.in
9073666771

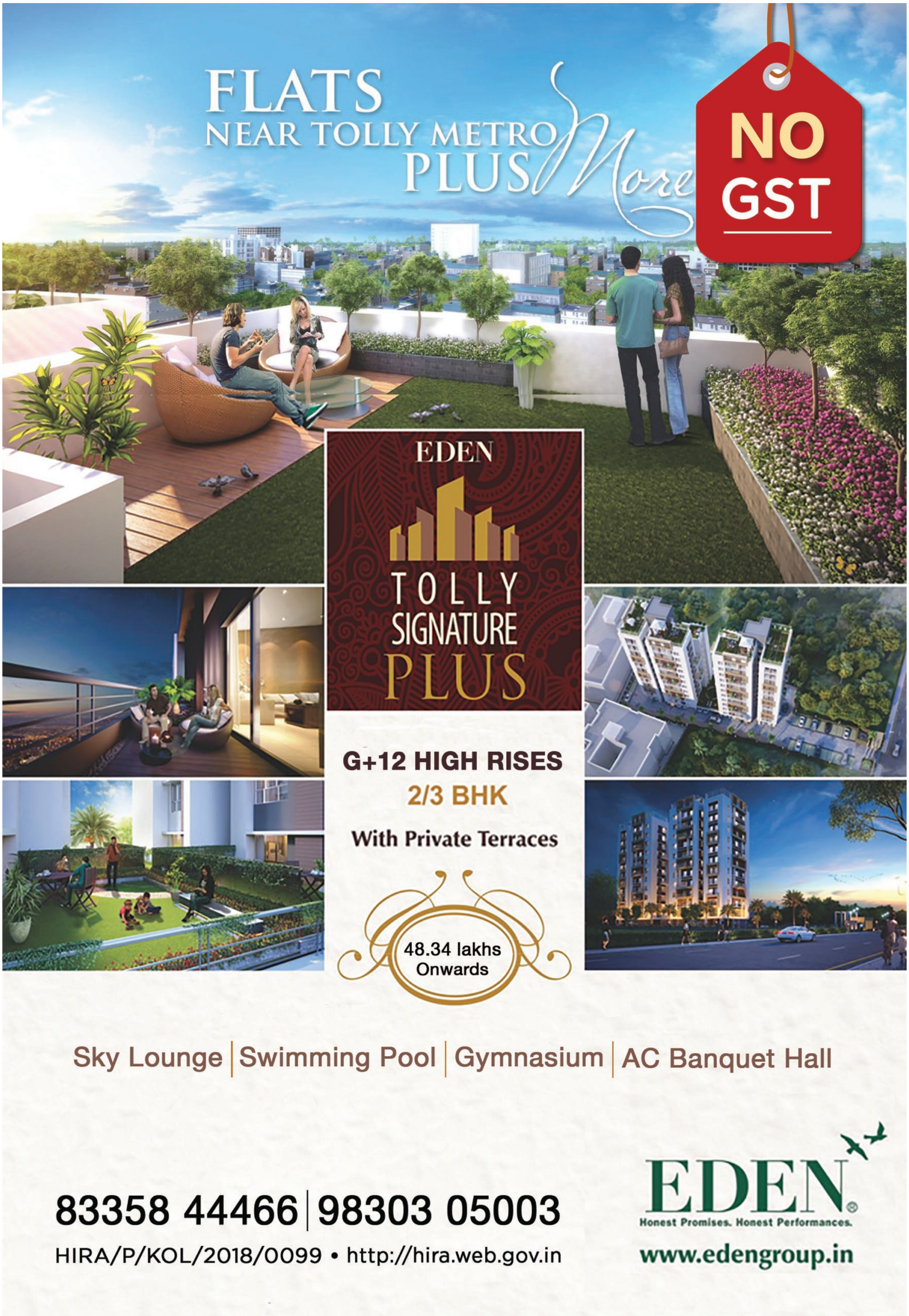
FLATS
NEAR TOLLY METRO
PLUS More
NO GST
EDEN
TOLLY SIGNATURE PLUS
G+12 HIGH RISES
2/3 BHK
With Private Terraces
48.34 lakhs Onwards
Sky Lounge | Swimming Pool | Gymnasium | AC Banquet Hall
83358 44466 | 98303 05003
HIRA/P/KOL/2018/0099 • http://hira.web.gov.in
EDEN®
Honest Promises. Honest Performances.
www.edengroup.in

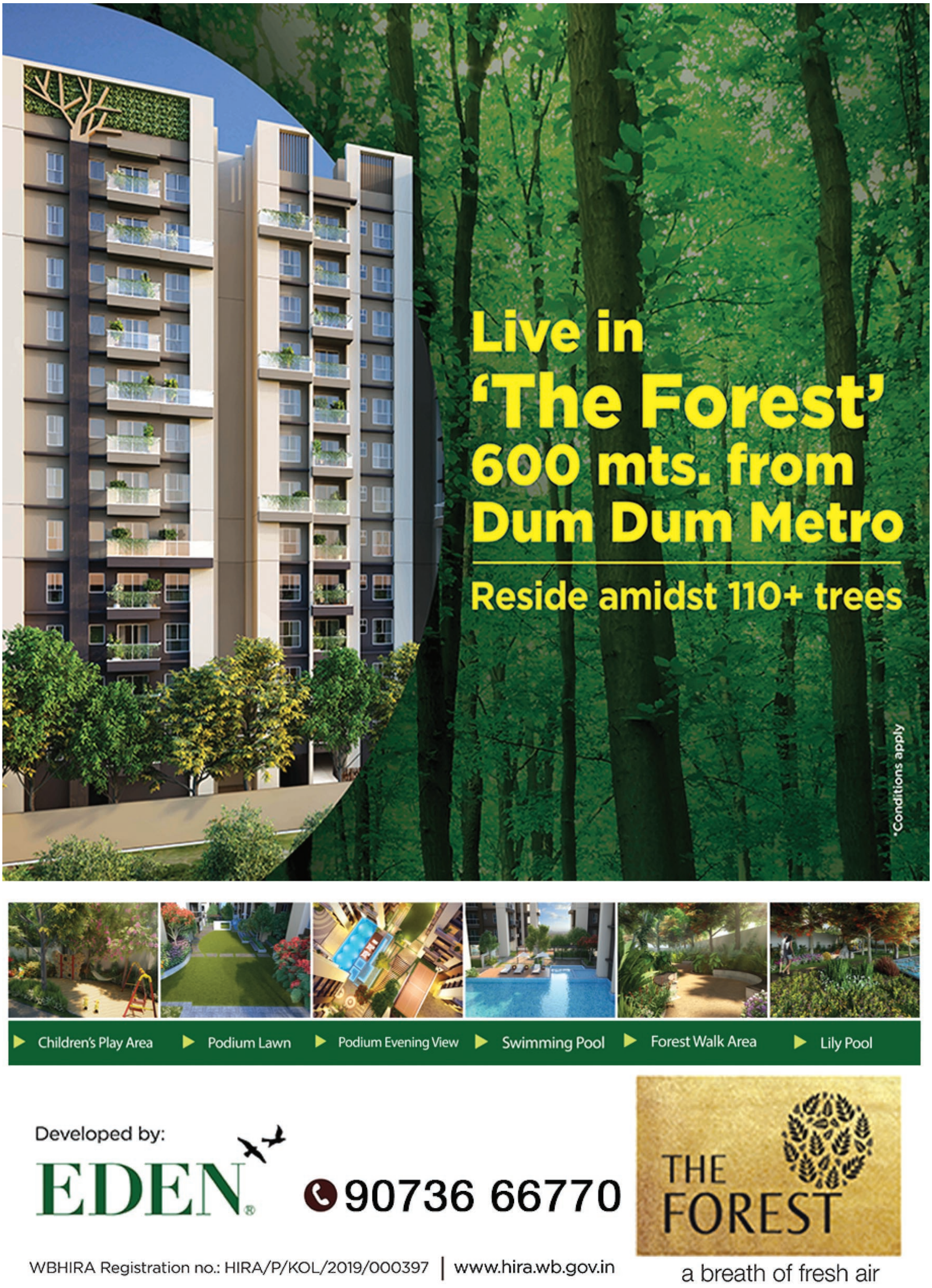
Live in
'The Forest'
600 mts. from
Dum Dum Metro
Reside amidst 110+ trees
*Conditions apply
Children's Play Area
Podium Lawn
Podium Evening View
Swimming Pool
Forest Walk Area
Lily Pool
Developed by:
EDEN®
90736 66770
THE FOREST
a breath of fresh air
WBHIRA Registration no.: HIRA/P/KOL/2019/000397 | www.hira.wb.gov.in